যেখানে এই ললিত-স্পন্দন প্রত্যক্ষ চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া সংযত সংস্কারে পরিণত হয় নাই—সেখানে বিচার অর্থহীন বৈচিত্র্যে পরিণত হয় এবং স্বাধীনতা বহু কষ্টে স্বেচ্ছাচার হইতে আত্মরক্ষা করে। কবির নিরঙ্কুশত্ব, কাব্যের ক্ষেত্রে, স্যাণ্ডোর মজ্‌লিসে বা ফ্যাক্টারীর কাঁটাবনে নহে।

কাজেই জন্মগত পৈতামহিক সংস্কার এবং আবহাওয়ার আনুকূল্য এযুগে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। নানাস্থানে বংশপরম্পরাগত আদর্শ যে সমস্ত শিল্পীপরিবারকে নৈপুণ্য দান করিয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করা হইতেছে। যে দেশসমূহে শিল্পের চক্রবাল, ফ্যাক্টারীর কবলের মাঝে কল্পিত হয় নাই, সে সমস্ত দেশের দিকেই অভিজ্ঞ দ্রষ্টাগণের চক্ষু ফিরিতেছে।

একের পক্ষে যাহা আয়ত্ত করিতে পর্ব্বতাকার প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিতে হয়, অন্যত্র তাহা শিশুহস্তই বিনা আয়াসে সম্পন্ন করে। কারণ সুকুমার কলারাজ্য কল্‌কবজা বা ম্যাশিন প্রভৃতির ক্ষেত্র নহে প্রকৃতির পশুশক্তিসমূহ আয়ত্ত হইলেই তাহা আয়ত্ত করা যায় না, কাজেই যাহারা প্রস্তর শৈলভেদ করিয়া টনেল রচনা করে বা নায়েগারার প্রপাতকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করে, তাহারা চিত্রকলারাজ্যে একটা প্রজাপতি আঁকিয়া তুলিতে পারে না।

এজন্যই কলা-চেষ্টাকে লক্ষ্যরূপে নানা অর্চ্চনা দ্বারা পরমার্থ করিয়া পৈতামহিক কাল হইতে যে সমস্ত কলাগোষ্ঠী সৃষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত গোষ্ঠীর শিক্ষা চেষ্টার নিকট আধুনিক শ্রেষ্ঠ কলা-বিচারকগণ মস্তক নত করিতেছে।

বস্তুতঃ শিল্পের ট্রাডিশন (tradition) বা যুগাগত প্রথা ও পদ্ধতি শিল্পজগতের একটা প্রধান সম্পত্তি—তাহাকে শীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া, প্রচুর গৌরব ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, নচেৎ এই কারখানা-যুগের সস্তা সমালোচনা দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়া এবং হাটের মাঝেও তাহা হেলায় অনাদৃত হওয়া স্বাভাবিক। সমজদারও এ যুগে পূর্ব্বসংস্কার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শিল্প সম্বন্ধে সংহত ধারণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কথা আছে, জহরীই জহর চেনে। যাহার জহরের দর্শন লাভ ঘটে নাই, জহরের ধর্ম্ম যাহার দুর্বোধ্য, তাহার উৎকট উৎসাহ বিপজ্জনক, সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ এই আমদানী রপ্তানী যুগে আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন। বহুকাল হইতে আহৃত শিল্পাদর্শ ও পদ্ধতির অগ্নি এই কলের যুগে মথিত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে—একবার নিবিলে তাহা পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করা ততটা সহজ নহে, সম্ভবও কিনা বলা যায় না।

ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে কোন লেখক বলেন*—"যে বাণিজ্য-সংগ্রাম বিগত দুই শতাব্দীর মাঝে ইউরোপের উপর ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা হইতে মধ্য যুগের অতি সামান্য শিল্পসম্পদ্ রক্ষা পাইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারত শিল্প তদ্দ্বারা এখনও

* The war of commercialism which in the last two centuries has swept over Europe carrying away all but a few feeble remnants of the middle ages has not got entirely overwhelmed Indian Art Art in India especially in the North is much more real & living, less artificial and exotic than it is in the great art-centre of Europe. Architecture in India is still a living art and practised on the principles which caused its wonderful development in Europe, in the twelfth and thirteenth centuries and then consequently and then alone the student of architecture has a chance of seeing the real principles of the art in action."

বিধ্বস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ উক্ত ভারতবর্ষে শিল্প-চর্চ্চা এখনও সজীব এবং খাঁটি, কৃত্রিম বা উড়ো জিনিষ নাই। ইউরোপ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। ভারতবর্ষের স্থাপত্য কলা এখনও জীবন্ত রহিয়াছে—ইউরোপের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে আদর্শ ও প্রণালীতে উহার চর্চ্চা ও উৎকর্ষ সাধিত হইত, ভারতে এখনও তাহা অন্তর্হিত হয় নাই। ভারতেই বাস্তবিক এই বিদ্যার আসল প্রণালীগুলি শিক্ষার্থীর নয়নগোচর হয়।"

বংশগত গোষ্ঠিজ্ঞান যেখানে সমাজকে পুষ্ট করিতেছে, যেখানে পত্রপুষ্পের ন্যায় শিল্পীচিত্ত অঙ্কুরিয়া উঠে, সেখানে আর্টিষ্টদের শিক্ষা ম্যানুফ্যাকচার্ড্ হয় না, শিল্পীরা শিল্পজন্মই লাভ করে, মাতৃঅঙ্ক হইতেই সৌন্দর্য্যকে আহরণ ও পরিস্ফুরণ করিতে শিখে—মাতৃস্তন্য-পানই সৌন্দর্য্য রসাস্বাদের স্থলে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

সহজ আনন্দের ভিতর দিয়া তাহারা রঙ্গিনীকলার অপরূপ শিক্ষাদ্বারা পুষ্ট হয়, শ্রমের তিক্ততা, শাসনের আনন্দহীন লৌহ-প্যাঁচে চিত্ত জীর্ণ হয় না, কলাধাত্রী শিশুকে আরাম-শয্যায় ঘুম পাড়ানিয়া গানের সহিত শিল্পস্বপ্ন দেখায়। পৈতামহিক শিল্পযন্ত্র, উপাদান, তুলিকা, সব কিছুই বাল্যকাল হইতে শিশুর চোখে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে—জীবনহীন অস্ত্ররূপে দেখা দেয় না। শরীর ও মন ক্রমশঃ এই শিল্প চেষ্টার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কলারস সমুচ্চয় অন্তর্গ্রহণ করে। এবং ভবিষ্যতের গভীরতর চেষ্টার উপযোগী হইয়া উঠে।

শিল্পীগণ, পশ্চিমে পুরাকাল হইতে বংশা-গত আবহাওয়ার সম্পদের মাঝে বর্দ্ধিত হইতে না পারিলেও সেখানে শিল্পাচার্য্যগণের আশ্রয়ে শিল্পার্থীরা কতকটা এই আবহাওয়া পাইত। বংশগত শোণিতের ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও, শিল্পাচার্য্যের ভবনে তাহারই অনুপ্রেরণায় শিল্পার্থীর জীবন ও আদর্শ গঠিত হইত। ইউরোপে কিছুকালপূর্ব্বেও শিল্পগুরুর বিশেষ পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া যশঃকামী তরুণ শিল্পী অগ্রসর হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি কাব্যে, ধর্ম্মে, সমাজে যেমন, তেমনি সুকুমার কলা-রাজ্যেও ভেদের ও পার্থক্যের দিক্‌টা দুঃসাহসের সহিত উদগ্র ও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এ যুগে প্রতিদিন নূতন ফরমায়েস হইতেছে, নূতন সম্ভার যোগান হইতেছে, একটা কিছু নূতন না করিতে পারিলে পশ্চিমে বাহবা পাওয়া দুঃসাধ্য হইতেছে। পশ্চিম নিত্য নূতনের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছে। কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি শাস্ত্রে নানাপথ নির্দ্দেশ হইতেছে এবং নানাপন্থী লোকের কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

সেখানে কিছুকাল পূর্ব্বেও কোন শিল্পী নানা আয়াসে আচার্য্যপদ পাইলে ক্রমশঃ তাহার চারিদিকে অনুরক্ত ভক্তগণ এক মজলিস্ গঠন করিয়া তুলিত। তরুণ শিল্পীগণ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ শিল্পরহস্যে দীক্ষিত হইত। ধীরে ধীরে শিক্ষানবিশীর কাল অতিক্রম করিয়া বহু চেষ্টায় তাহার অনুমত শিষ্যত্ব লাভ করিতে এবং ক্রমশঃ তাহার সহিত উচ্চতর কার্য্যে যুক্ত হইয়া সাহচর্য্যে সৌভাগ্য লাভ করিত। যথাসময়ে সে শিল্পাচার্য্যের পদ-লাভ করিয়া ওস্তাদের নির্দ্দিষ্ট পথেই চলে, তাহার প্রণালীকেই পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। পূর্ব্বানুসৃত গুরুর সহিত যোগসূত্র ছিন্ন না

করিয়া, তাহার শিল্প-প্রতিভা অগ্রসর হইত এবং স্বকীয় সাধনলব্ধ বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা গুরুপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াই স্থলবিশেষে ওস্তাদের কার্য্যকেও অতিক্রম করিত।

সেদিন পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে সম্প্রতি অধ্যাপক আছে, ওস্তাদ নাই, শিল্পগোষ্ঠী কিম্বা শিল্পমজ্‌লিস্ নাই, আর্টস্কুল আছে। তফাৎ এই, সেকালে যাহা হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হইত, এখন তাহা কলের চাপে হয়। শিল্পদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই কলের মতই পরস্পরের সম্পর্ক রক্ষা করে। ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

বিচিত্রপুর।

পদ্মার মধ্য × × × × তাম্রি বায়ু কোণে,
যে দেশেতে ধানের খেতে মারায় সর্ষা বোনে।
কলাই খেতে দিনে রেতে নদা দেয় পাহারা,
শাক চুরণী নারীদের দেয় গরুর মত তাড়া।
নতুবা সে এক নিমিষে খেতের দফা শেষ,
চোর চুরা আর বাজ্জাত জা'ত ভিখারীর দেশ।
কুকুর বিড়াল ওদের বাড়ী কেন ঢুকু না পায়,
পিপ্ড়ার মুখে ক্ষুদের কণা দেখ্‌লে কেড়ে খায়।
ক্ষুধার জ্বালায় কুর্ত্তা বিড়াল ফিরে বাড়ী বাড়ী
ছিটালে না পায় কোথাও অন্ন গোটা চারি।
শত অন্ন রাখ্‌বে পাতে সেত দূরের কথা,
একটী ভাতের শত অংশ ফেল্‌তে পায় যে ব্যথা।
চাকরী বিনা একটী সন্ধ্যা জ্বলেনাক চুলা
দোণের মত পেটটী, তবু মুখে ধুনেন তুলা।
অনাহারে উপবাসে বিদেশ যখন যায়,
দৈববশে ভাগ্যবশে চাকুরী যদি পায়,
তখন তাহার লাগ পায় কে, গপ্পে মারেন হাতি,
নবাবের পো নবাব যেন সকতজঙ্গের নাতি।
যার জোটেনা মুষ্টিভিক্ষা, উপাস করে নারী,
"কাউয়াপীরের" মাগন মেগে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
কলমী শাক আর কেচ্‌বা দল আর শাপলা শালুক হায়,
পেটের দায়ে অভাগীরা সিদ্ধ করে খায়।
কিন্তু তিনি গপ্প করেন, চাকুরী করেন সখে,
দাদার সঙ্গে বনল নাকো, কাকায় বড় বকে।
নতুবা তার দেশে আছে হাজার টাকা আয়,
প্রতি বছর সাতশ মণ সে ধান সরিষা পায়।
দশ কাণি জমিনে পাটের ন'খান খাটে হাল,
ধৈনা খেতে চাষ দিতে তার শ খান ভাঙ্গে ফালি।
তিনকুড়ি তার মহিষ বলদ ছয় কুড়ি তার গাই,
ছাগল ভেড়া আড়াই কুড়ি, বাছুর গণা নাই।
ছ' মণ দুধে ন' মণ ক্ষীর শ মণ জমে দধি,
দশ বিশ মণ ঘৃত মাখন—ঘোলের গঙ্গা নদী।
ভগ্নীপতি উকীল তাহার, ডিপ্‌টী তাহার শালা,
দারোগা তার বড় মামা, বেহাই সদর আলা।
জরাকের তার শ্বশুর বাড়ী, মালখানগর পিসী,
রেলীর বাবু গাত্তার মেসো তিনি কিনেন তিসি।
মগেলিন সকট্রা লুচু- তালুক কতক গুলা,
বোর্ণিও শুমাত্রা যাবা মালয় পেনিনসুলা।
আটলাণ্টিক প্রেসিফিক ওশান জলকর আমেরুন,
বনকর সে বম্মা আসাম্-শাল শেগুনের বন!
সিলেট কাছাড় নাগপুরের সে নারাঙ্গী কমলা,
ফলকর তার মুন্সীগঞ্জের মোহন বাঁশী কলা।
বাড়ীটা তার সাত কাণি ভুঁই দশ কাণি তার বেড়া,
চৌদ্দ কাণি দীঘী পুকুর আম গুপারি ঘেরা!
বাড়ীর ভিতর দোতালা ঘর কাঠের সিঁড়ি তার,
জাপানী চিক ঝোলে তাহার হেঙ্গিং বারান্দায়।
বাহির বাড়ী পুবের ভিটায় পূজার ঘরের পাছে,
আধমণি সব বেল ধরে সেই বেল্লুরা বেলের গাছে!
লীলা ধন্যা পত্নী তাহার × × × বিলাসিনী,
বিনা তারের টেলিগ্রামে ভালবাসেন তিনি।
কল্কাটায় কেন্‌বাস্ বোনেন্ নানান্ প্যাটার্ণ,
বিল্লি বিল্লিক বাইসিকেলে বিল্পা বিলক্ষণ।

লাল্ছা রঙ্গের কাল্ছা আভা সাদা-পোড়া ঠোঁটে,
মাঘের শেষে হৃষ্যি যেন পুয়া ভেঙ্গে ওঠে।
লগ্নী ঘরে অগ্নি জ্বালে ভগ্নী লক্ষ্মী বাই,
সিলেট কাছাড় মালে আছাড় বিলাত ছাড়েন নাই।
ভাইঝি গেছেন আই-জি-এস-এন, বিলাতী ষ্টীমারে,
ভাইপো গেছেন জাপান তাহার সাপান শিখিবারে।
বাড়ীতে তার মা ঠাব্রুণ—বয়েস যেটের কাছে,
নিত্যি তাহার ব্রত পূজা পাইল পার্ব্বণ আছে।
আশুণ মাসে নাটাইচণ্ডী—দু'মণ চালের পিঠা,
সঙ্গো দিয়ে মাল্পো ভাজেন—ন মণ গুড়ে মিঠা।
মাঘে পূজে 'নিদান খেতর' ভাজা চালের গুড়ি,
দু'চার ছড়া আইঠাকলা—দু'চার মণ খৈ মুড়ি।
চৈত্রি মাসে বিষুর দিনে ছ'মণ ছাতু লাগে,
(পদ্মাতে ফেলিলে বুঝি "চর জাজিরা" জাগে।)
নারদের গায়দের এরা পিশাচ মূর্ত্তিমান,
পরের শুভ চক্ষু-শূল যশে জ্বলে কাণ।
পরের মন্দে মহানন্দ মন্দ হাস্য মুখে,
পরের হাস্তে শোক নৈরাশ্যে আগুন জ্বলে বুকে।
পরের ধনে পরের মানে হিংসা নিরন্তর,
কেউ বা পাছে বড় হয় এই ত বিষম ডর।
পরের বাড়ী ছেলে হলে জোকার শুনে যদি,
কংসের মত ধ্বংস ভয়ে কাঁপে নিরবধি।
পুরুষ হতে নারীগুলি অধিক হিংস্র ঠক,
বেতের চেয়ে বেতের ছেয়ে বিষম মারাত্মক।
তালের গাছে খেজুর গাছে খাজ কাটা বই নয়,
ডাউগা পাতার শূল্পী করাত দেখতে লাগে ভয়।
বাঁশ পাতা কাওলা পাতা ডুমুর পাতার ধার,
গাছের চেয়ে চোত্রা পাতা বিষম যন্ত্রণার।
মাধ্না লতা ফুল পাতা বিষম কাঁটা ভরা,
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের শরশয্যা করা।
পরের শ্রীতে এদের চিত্তে শল্য সেন জাগে,
জন্ম কর্ত্তে তাঁহার পাছে গ্রাম শুদ্ধ লাগে।
মিথ্যা সাজায় মোকদ্দমা মিথ্যা নালিশ করে,
নারী পুরুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে ঘরে ঘরে।
পরের যাত্রা ভঙ্গ করে কেটে নিজের নাক,
লজ্জা শরম জাতিধরম থাকুক কিম্বা যাক।
নারীগুলা বেশী চালাক, মর্দ্দাগুলার বাবা,
আপনি আগে পাণটী খেয়ে পুর্যেরে দেয় চাবা।
দিবা রাত্রি সমান করে কেলেঙ্কার কোন্দল,
জ্বালামুখী উল্কামুখী খেকুশিয়ালীর দল।
মেয়ে বুড়া নাই ভেদাভেদ সবাই এক সমান,
ক্ষুরের চেয়ে তুখর অতি মুখর খরশাণ।
"তোদের বাড়ীর হাওয়া কেন্লো মোদের বাড়ী বয়,
মোদের রোদে তোদের কেন ধান শুকান হয়?
মোদের রবিবারকে কেন বল্বি রবিবার,
তোদের বুঝি বছর ভরা দিন নাইকো আর?
আম্‌রা বলি বৈশাখ যদি তোরাও বল্বি তাই,
তোরাও খাবি ছারকপালী আম্‌রা যারে খাই?
দই দুধ ঘি মাছটুকু এই—আর ত কিছু নয়,
পোড়ামুখী এও তোদের সহ্যি নাহি হয়?
মোদের যাহা কিন্‌তে যাব তোদের কিন্‌বে তাই,
বাজার করি মাথি, কিন্‌তে রাজার সাধ্য নাই।
কতই খাবি রাক্ষসীরা কতই আছে টাকা,
তোদের তরে দেশে যে লো আর যায় না থাকা।
ভাতার পুতের মাথা খা না, এতই যদি ক্ষুধা,
(ধন্য ধন্য সর্ব্বংসহা বিচিত্র বসুধা।)
আগুন লাগুক টাকার বাক্‌সে পুড়ে হোক সে ছাই,
দেবে ধর্ম্মে দেখুক সবে, এই ত কেবল চাই।
হিংসুকেদের দেও হে শাস্তা ওহে ধর্ম্মরাজ,
দেখে তোমার উচিত বিচার চক্ষু জুড়াই আজ।"
জল আনিতে ঘাটে গিয়ে আগে বসে * *
কল্‌সী ভরে তাহার পরে ফল্গু নদীর স্রোতে।
সেই জলেই রাঁধে বাড়ে সেই জল সবে খায়,
বাপের পিণ্ডি ঢালে তাতে গদাধরের পায়।
বেড়ায় লাগা হাগা-গাছ সে রান্নাঘরের পাছে,
কেহ গেলে রান্নাঘরে, কেহ গেলে গাছে,
দু'জনার সে শব্দে গন্ধে দু'জনাতে ভোর,
জগতে নাই এমন মিলন মধুর মাণিক-জোর।
হাগ্‌তে গিয়ে জল নেয়না, ঘাটে এসে শোচে,
আধা ও সে ঘাটে যেতে শাড়ীর কোণায় মোছে।
শোচা জলে হাত পা ধোয় মুখ পাখালে আর,
কমল মুখের সমল গন্ধে ভ্রমর ঘুরে যায়।
করমে যার করম জানা লজ্জা শরম নাই,
পথে পড়্লে অন্ধ সেজে আরেক দিকে যাই।
পুরুষগুলা বারমাসই বিদেশে প্রায় থাকে,
একলা নারী একলা বাড়ী বউ কথা কও ডাকে।
তিন দিনে নিবিলে আলো চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে,
সারা বছর আঁধারে তার চাম্‌চড়া বাস করে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কৈবল্য।

সকল জ্ঞানের সার জ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞান, সকল সাধনার সার সাধনা, ইচ্ছা-যোগ-সাধন। এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক-তত্ত্ব-সুধা পান, মানবের চরম লক্ষ্য। সকল নদীর গতি, মহা সমুদ্র, সকল মানবের মহা নিবৃত্তি, একে আত্ম-সমর্পণ। এক এক দেশে নদ-নদীর পৃথক পৃথক নাম আছে বটে, কিন্তু তাহা যখন মহা সমুদ্রে বিলীন, তখন সে সকল নামাতীত শুধু গুণ-সমষ্টি। মানব-সাধারণের পার্থক্য বিচার এ ধরায় সদাই পরিলক্ষিত হইতেছে কিন্তু তাহা যখন অতীন্দ্রিয়ে নিমজ্জিত, তখন নামাতীত মহাসাম্যে প্রদীপ্ত। ভেদ পথে, লক্ষ্যে সকল একাকার। বিশ্বেশ্বরের মহা ইচ্ছার-মিলন-রাজ্যে ভেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সম্প্রদায় নাই,—সকল একাকার। সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার। অদ্বৈত-জ্ঞান ধর্ম্মজগতের চরম জ্ঞান।

বিজ্ঞান বলেন, জড় জগৎ অণুপরমাণু, ইথার বা বিদ্যুতের বাহ্যপ্রকাশ। এমারসন, কারকাইল বলেন, জগৎ কেবল শক্তির (Force) বহিপ্রকাশ। অণু পরমাণু ভাবিতে ভাবিতে শেষে আর কুল পাওয়া যায় না, শক্তিসিন্ধুতে সব একাকার হয়। জলবুদ্বুদের সমষ্টিতে সাগর, অণুপরমাণুর সমষ্টিতে জড়জগৎ। শেষে চিন্তার অনতিক্রম্য সীমা-রেখার পশ্চাতে উঠিতেছে, পড়িতেছে কেবল শক্তির তরঙ্গ, অথবা চিদাভাস। একের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু ভাবিবার উপায় নাই। অদ্বৈত-চিন্তা জগতের চরম সার চিন্তা।

এক হইতে সকল উদ্ভূত, অথচ দেখিতেছি, সকলই পৃথক,—একের সহিত অন্যের মিল নাই। পাত্রভেদে যেমন এক সমুদ্রের জল পৃথক রূপ ধারণ করে, সেই রূপ, পাত্রভেদে একই শক্তি বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের রশ্মি জড়ের পৃথকত্ব ঘোষণা করে, অন্ধকার জড়ের একাকারত্ব প্রতিপন্ন করে। জাগিয়া দেখি, জগতের সব পৃথক পৃথক, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখি, সব একাকার। এ বিশ্ব ফুটিয়া ফুটিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। জাগরণ এবং মরণ—সব একাকার।

কেহ কেহ বলেন, দ্বৈতবাদই মানবের নিয়মক। বেদান্ত বলেন, অদ্বৈত-জ্ঞানই চরম সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, দ্বৈতাদ্বৈত-জ্ঞানই সত্য। ইহার মধ্যে কোন কথা সত্য, কে জানে?

আমি, তুমি, সে, কত পৃথক পৃথক। জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ কত পৃথক, কত পৃথক। এ দেশ সে দেশ, এ জাতি সে জাতি, কত পৃথক, কত পৃথক। বৈষম্য যেন জগৎকে গ্রাস করিয়াছে। কোথায় সাম্য? কোথায় মিলন? কোথায় অদ্বৈত-জ্ঞান? জগতে যে যে এত কাটাকাটি, মারামারি, রক্তারক্তি, সে সকল কাহার অভিব্যক্তি? কেবল বৈষম্য, কেবল বিরোধ, কেবল অনৈক্য, কেবল অপ্রেম। জন্মলাভ করিয়া চলিতে, চলিতে, চলিতে—লোক-সাধারণ হইতে কত পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। পিতা পুত্রে মিল নাই, স্বামী স্ত্রীতে মিল নাই, কত বিরোধ, জগতে কত

মত-সংঘর্ষণ। নানা মুনির নানা মত! রাজা প্রজায় দ্বন্দ্ব, ধনী দরিদ্রে বিবাদ, জ্ঞানী মূর্খে বিরোধ! কত বক্তারক্তি! তাঁহাবা বলেন, যে বলে অদ্বৈত-জ্ঞান সত্য, সে মহা ভ্রান্ত।

বিভ্রান্ত পুত্র (Prodigal son) পিতার পুণ্য আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত বিপথে চলিতেছিল। পাপের পথে চলিতে চলিতে শেষে অনুতপ্ত হইয়া আবাব পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। আবাব পিতা-পুত্রেব মিলন হইল। আবাব মহামিলনেব জয় ঘোষিত হইল।

আমবা সকলেই, জন্মগ্রহণেব পর, ক্রমাগত ছুটিয়া ছুটিয়া বিপথে চলিতেছি। স্বাধীন ইচ্ছা (Free-will) আমাদিগকে ক্রমাগত প্রবৃত্তিব পথে লইয়া যাইতেছে। উদ্ভ্রান্ত পথিক আমরা ক্রমাগত মবণের পথেই চলিতেছি। পিতা-পুত্রের বিবোধ, সুতবাং অপরিহার্য্য। দ্বৈতবাদ আমবা স্বীকাব করিব না, তবে কে স্বীকাব কবিবে?

কিন্তু ইহাই কি জীবনেব লক্ষ্য? ছুটিয়া ছুটিয়া কোথায় চলিয়াছি? সম্মুখে নবক মুখ ব্যাদান কবিয়া সমাগত! কে রক্ষা করিবে?

ক্রমাগত চলিতে, চলিতে;—পাপেব সেবা করিতে করিতে, শেষে সকলেবই চৈতন্যোদয় হইতেছে। কাহার ইঙ্গিতে যেন আমবা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতেছি। প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু আবার কে যেন আহ্বান করিতেছে। সে কি নিবৃত্তির আহ্বান?

রিপুর অত্যাচার আর নাই—গতি স্থিব, চক্ষু আর রূপ-পিপাসার জন্য প্রমত্ত নয়, কর্ণ আর সুকণ্ঠের ধ্বনি শুনিতে লালায়িত নয়, কি-জানি-কেন যেন আমাদের ইন্দ্রিয় নিশ্চল, নিস্পন্দ, ভাব-বর্জিত। তুমি যত কেন চেষ্টা কব না, প্রবৃত্তিব পথে শেষে আর যাইতে পাবিবে না। হাতের কাজ পড়িয়া রহিল, পা আব প্রবৃত্তির পথে চলে না, সে নিরঞ্জন-তীরে প্রধাবিত। কি সম্মোহন! কে ধরিয়া টানিতেছে?

এই রূপে, শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব পাইলেন, সল পল হইলেন, দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হইলেন, রূপসনাতন ফকীবি লইলেন, মহা পাপী জগাই মাধাই ভক্ত হইলেন। এইরূপে, একজন নয়, শত জন নয়, লক্ষ লক্ষ জন সংসাব-বিজয়ী হইয়া, মহা নির্ব্বাণের পথ অনুসবণ কবিলেন। কে বলে পাপ জয়যুক্ত এবং পুণ্য পবাজিত? সংগ্রামের পর সংগ্রাম—শেষে কিন্তু পুণ্যই জয়যুক্ত হইতেছে। জগৎকে সন্ত্রাসিত কবিযা এইরূপে ধর্ম্ম চির কালই জয়যুক্ত হইতেছেন।

বাজা প্রজায় যখন মতের সংঘর্ষণ, তখন ফবাসী বিপ্লব বা অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত। দেশে দেশে যখন বিবোধ, তখন ক্রুসেড উপস্থিত। জাতিতে জাতিতে যখন বিবোধ, তখন রাম-বাবণের যুদ্ধ। জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে যখন মত-সংঘর্ষণ, তখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। পিতা পুত্রে যখন বিরোধ, তখন হিরণ্য-কসিপু-বধ। এইরূপ মহা যুদ্ধ সংসাবের সর্ব্বত্র। জয়যুক্ত হইতেছে কে বলত? পুণ্যশ্রী চিবদিনই ধর্ম্মেব অঙ্কে জয়যুক্ত হইতেছে। দেখ মানুষ, চাহিয়া চাহিয়া, একবার, অদ্বৈতের লীলা-খেলা দেখ।

যখন আমরা লক্ষ্যহারা—তখন এ জগতের সকলই আমাদেব পর;—তখন পিতা পুত্রের মিল নাই, স্বামী স্ত্রীতে ঐক্য নাই, রাজায় প্রজায় বন্ধুত্ব নাই, ধনী দবিদ্রে সদ্ভাব নাই, জ্ঞানী মূর্খে প্রণয় নাই। আর যখন আমরা

লক্ষ্যে উপনীত, তখন শাক্ত বৈষ্ণবে বিরোধ নাই, হিন্দু মুসলমান এক বিধানের দুই সোপান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান এক মহামায়ার দুই লীলা। সম্মিলিত যোগীচতুষ্টয় সত্যই সাধু বিজয় কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"আমরা চারি দলের চারি জন যখন পথে ছিলাম, তখন মারামারি করিয়া মরিয়াছি, এখন লক্ষ্যে পৌছিয়া একাত্মক হইয়াছি। আমাদের চারি জনের ইচ্ছা একমহাইচ্ছায় সম্মিলিত।" কি সুন্দর কথা।

আমরা জীবনের শেষ অঙ্কে উপনীত হইয়া এখন এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে ইথার বা প্রকম্পিত অণু পরমাণু বা বিদ্যুৎ বলেন, দার্শনিকগণ যাহাকে শক্তি বলেন, ধার্ম্মিক যাহাকে চিদাভাস বলেন, তাহা আর কিছুই নয়, তাহা মহামায়ার মহা-ইচ্ছা। আবাহমান কাল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া একটী মহা-ইচ্ছার তরঙ্গ চলিয়াছে। সাগরে তাহা শব্দব্রহ্ম, অরণ্যে তাহা বাড়-বাগ্নি, জড়ে তাহা টর্পেডো শক্তি, জীবে তাহা চৈতন্য, আকাশে তাহা ইথার, বিদ্যুৎ বা ঝড়। ঐ এক মহা ইচ্ছা চিরদিন ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে। ঐ ইচ্ছার কণিকা পাইয়া আমরা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াই, অহংজ্ঞানে আত্মহারা হই। কিন্তু সময়ান্তরে, যখন ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়, তখন খ্রীষ্ট বলেন, "I and my father are one" শ্রীচৈতন্য বলেন, "আমিই সেই", তখন জীব এবং শিব একাকার—এক-ইচ্ছুক, এক-তন্ত্রী। এই ইচ্ছা-যোগ-সাধন মহা সাধন। এই সাধনে যাঁহারা সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, পাপ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, তাঁহারা জীব-প্রবাহে নারায়ণের প্রকট ছবি দেখিয়া আত্মহারা হন, রিপু তখন নির্ব্বাণ, তখন বিবেকানন্দ বলেন—"জীবই শিব -দরিদ্রগণ এ সংসারে প্রকট নারায়ণ।"

আমাদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,কোন্ সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন? আমরা বলিব, ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা-যোগ-সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন। রিপু জয় করা কঠিন নয়, যশ নিন্দার অতীত হওয়াও কঠিন নয়। বহিরঙ্গ সাধন অথবা পূজা-অর্চ্চনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হওয়াও কঠিন নয়;—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন, স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিলোপ সাধন। এক সুরে সুর বাজিবে, এক তন্ত্রীতে হৃদয়-মন মিলিবে,—স্বাতন্ত্র্য, স্ব-অধীনতা, অহংজ্ঞান, কামনা, বাসনা—সব লোপ পাইবে, স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-বর্জ্জিত নরহরির আবির্ভাব হইবে। কৈবল্য সাধন আর কিছুই নয়, অজপা-সাধনও আর কিছুই নয়,—নিত্য-নিরঞ্জনে আত্ম-বিসর্জ্জনই ঐ সকল সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। "আমি" আমি নই, আমার প্রাণ মন আমি নই, আমার বুদ্ধি বিদ্যা আমি নই—আমার দেহ ইন্দ্রিয় আমি নই। আমি যেন কলের পুতুল; কেহ চালাইতেছে, তাই চলিতেছি, কেহ বলাইতেছে, তাই বলিতেছি। আমার ইচ্ছায় আমার চক্ষের পাতা পড়ে না, আমার ইচ্ছায় শ্বাস প্রশ্বাস চলে না, আমার ইচ্ছায় রক্তপ্রবাহ ছুটে না। আমি কে যে, জীব, ক্রমাগত, "আমি আমি" করিতেছ? তুমি যে শুধু মায়া-মিথ্যার ভেল্কী, ভোজের অলীক খেলা! এক দিনও তুমি ইচ্ছা করিয়া বাঁচিতে পার না, এক দিনও তোমার চেষ্টা-যত্নে জীবন ধারণ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য। তবে, কেন "আমি আমি" করিয়া মরিতেছ? "আমিত্ব" এবং "স্বামীত্ব"-জ্ঞান সর্ব্বনাশের মূল, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা জীবের বিনাশের হেতু। সাধন

করিতে হইবে, আমি কিছুই নহি, কেবল তিনিই সার। তিনি পরিবারে পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা; রাজ্যে রাজা প্রজা; সমাজে বড় ছোট, দেশে ক্ষুদ্র মহৎ। সকলেরই প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন আছে, এবং প্রয়োজন থাকিবে। ছোট বড় সব লইয়াই পূর্ণত্ব। তাই অনন্ত জগতে অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত রূপ। অথবা অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিতে এক অখণ্ড অনন্তরূপিণী মা ছুটিতেছেন, হাসিতেছেন, বিরাজ করিতেছেন। অনন্তকে সান্তে দেখিতে হইবে, এবং সান্ত ধরিয়া অনন্তে পৌছিতে হইবে। সেই সাধনই মহা সাধন। তাহাই কৈবল্য।

বাসনাকে যে সংযত করিতে শিখে নাই, মহা মিলনের পথে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন। পারিবারিক মিলন, সামাজিক মিলন, জাতীয় মিলন, রাষ্ট্রনৈতিক মিলন, সকল মিলনের মূলই স্বতন্ত্র-ইচ্ছা বা স্বেচ্ছা-বর্জ্জন। যেখানে ইচ্ছায় ইচ্ছায় সংঘর্ষণ, সেইখানেই বিরোধ, সেইখানেই পৃথক বোধ। ইচ্ছায় ইচ্ছার মিলন-সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন।

"ক খ" না শিখিলে যেমন জ্ঞানের অনুশীলন অসম্ভব, গৃহ, পরিবার, সমাজ ও দেশ ভুলিয়া বিশ্বপ্রেম সাধনও তেমনি অসম্ভব। সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অসীমে পৌছিতে হইবে। আমার গৃহ, আমার পরিবার, আমার দেশ, আমার পিতা মাতা, আমার সাধনার ক্ষেত্র। যে এ সকলকে উপেক্ষা করে, কৈবল্যে সে পৌছিতে পারিবে না। আমার গৃহ, আমার পরিবার কে আমার সম্মুখে আনিল? যিনি আনিলেন, ইহার ভিতরে তাঁহার ইচ্ছা দেখিতে হইবে। গৃহ পরিবারে ইচ্ছার যোগ-সাধন, তৎপর সমাজের ইচ্ছার সহিত মিলন, তৎপর দেশের, —তৎপর রাজ্যের, তৎপর পৃথিবীর—তৎপর বিশ্বের। অথবা ঘরে যিনি, তিনিই বাহিরে; অন্তরে যিনি, তিনিই ভুবনে। দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া তন্ময় হইতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা গৃহে পরিবারে, সমাজে দেশে, রাজ্যে ও জগতে, ক্রমে ক্রমে বিশ্বভুবনে—দেখিতে দেখিতে, ডুবিতে ডুবিতে আত্মহারা হইয়া তিনিময় রাজ্যে উপনীত হইতে হইবে। যখন উপনীত হইবে, তখন বুঝিবে, বিশ্বমানবের স্বরই তোমার স্বর, বিশ্বের বাণীই তোমার বাণী, বিশ্বের কৃতিই তোমার কৃতি। তখন তোমার আর পৃথক অস্তিত্ববোধ থাকিবে না—তখন তোমার দেহ মন প্রাণ সব যেন কোন্ অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে,—তুমি ইচ্ছা-বর্জ্জিত জড়ভবত হইয়া অচ্যুতপদ লাভ করিয়াছ। তখন কেশবের "self" আকাশে উড়িয়া গিয়াছে, তখন এক-জ্ঞান, এক-ধ্যান এক-রস-সুধাপানে দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা। তখন সেই প্রাচীন কালের "একমেবাদ্বিতীয়ং" ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ। তখন "কৈবল্য" নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া এই ধরায় অবতীর্ণ। মানুষ তখন দেখে আর মজে, মজে আর দেখে। তখন চিদানন্দে জগৎ পূর্ণ।

ঋষি গৌরগোবিন্দ একদিন বলিয়াছিলেন, কোন সময়ে ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার ইচ্ছার বিরোধ ঘটে। তিনি এ জন্য দারুণ যন্ত্রণা পান। অবশেষে কিছুতেই ইহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া দুই বৎসর তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। এই অবসরে, ঘটনা-সূত্রে উভয়ের, ইচ্ছার বিরোধ দূরীভূত হয়, মত-সামঞ্জস্য বুঝিতে পারিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ব্রহ্মানন্দের সহিত আবার মিলিত হন।

ঋষিকল্প রামতনু একদিন বলিয়াছিলেন, কোন কারণে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার ইচ্ছার বিরোধ ঘটিয়াছিল। বহুদিন নির্জ্জন চিন্তার পর সেই বিরোধ দূর হয়।

ম্যাটসিনি বলিয়াছিলেন, বিশ্বমানবের সহিত যখন তোমার ইচ্ছার বিরোধ হইবে, তখন বহুদিন নির্জ্জন বাস করিবে, মনে রাখিবে, হয় তোমার ভুল, নয় বিশ্বমানবের ভুল। এই ভুল সমীকরণের উপায় আত্মচিন্তা ও প্রার্থনা। বহুদিন আত্মচিন্তা ও প্রার্থনার পর ইচ্ছার যোগ বুঝিতে পারিবে।

ছোট হরিদাসের সহিত চৈতন্যদেবের ইচ্ছার বিরোধ হইয়াছিল। এ জন্য ছোট হরিদাস জীবন ত্যাগ করেন। জুডাস ইস্কেরিয়টের সহিত খ্রীষ্টের ইচ্ছার বিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে খ্রীষ্টের দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল।

সাধনার গভীর রাজ্যে অগ্রসর হইলে বাসনার উত্তেজনা বিলুপ্ত হয়। গভীর ধ্যান ও নিগূঢ় ভজন পথে আত্মা সমর্পিত হইলে, বাহ্য-চিন্তা, বাহ্য-কোলাহল, বাহ্য বাসনার স্পৃহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। নিস্পৃহ, নিষ্কাম, সংযত হইতে হইতে শেষে মানব এমন এক অচ্যুত রাজ্যে উন্নীত হয়, এখন তাঁহার আর পৃথক ইচ্ছা থাকে না। যে ইচ্ছার তরঙ্গ আবহমান কাল জগতে পরিব্যাপ্ত, তাহার সহিত তখন মহা-মিলন হয়। পিতা পুত্রে আর বিরোধ থাকে না। স্বতন্ত্র ইচ্ছা তখন সংহত, সংযত বা সংবৃত। পরিবারে, সমাজে, দেশে, মণ্ডলীতে তখন একতার একতন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তখন ধরা স্বর্গে পরিণত হয়। তখন জাতীয়তার মহা মিলন ধরায় অবতীর্ণ হয়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে, অবস্থা এবং ঘটনার বৈপরীত্য উন্নতির সোপান—বৈষম্য মহাসাম্যের নিদান। অনন্ত ঘটনার অনন্ত রূপ। ঘটনার পারম্পর্য্যমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহী অদেহীর ইচ্ছা-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া তখন সচ্চিদানন্দে বিভোর হইতে থাকেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এই মহামিলনের সুন্দর দৃশ্য আমরা পূর্ব্ব-বঙ্গ-পার্টিসনের দিনে এই বঙ্গে দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তখন এক সুরে বঙ্গের নর-নারীর প্রাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই বঙ্গে বিধাতার এক অচিন্ত্য লীলা প্রকটিত হইয়া-ছিল। আবার কি সে মহাপ্রাণতা এদেশে জাগিবে ?

তোমরা বল সব পর পর, আমরা বলি, সব এক। তোমরা বল বিভিন্নতা, বৈষম্য, বৈপরীত্য। আমরা বলি, বিভিন্নতায় একতা, বৈষম্যে সাম্য, বৈপরীত্যে উন্নতির বীজ নিহিত। দুঃখ ধরিয়া সুখে, অশান্তি ধরিয়া শান্তিতে, শত্রু ধরিয়া মিত্রতায় উপনীত হই।

প্রেয়ের সংগ্রামে যতদিন আমরা অস্থির, ততদিন একীকরণ বুঝি না, কিন্তু যখন প্রেয় নির্ব্বাণ, যখন শ্রেয় জাগরিত, তখন দেখি, সকল প্রাণে, সকল ঘটনায় কেবল এক মহা ইচ্ছার তরঙ্গ খেলিতেছে। পাপ-অসুর-সংগ্রামের দিনে যে বীরত্ব, যে স্বামীত্ব, যে অহং জ্ঞান জাগিয়াছিল, তাহা এখন নির্ব্বাণ, এখন অসুর বিজয়ী বীর সংযমপূত হইয়া মহা ইচ্ছা-সাগরে নিমজ্জিত। মহা অন্ধকারে সব একা-কার, তাহাতে ভাসিতেছে, শুধু মহা ইচ্ছার জ্যোতি-তরঙ্গ। এখন আর পার্থক্য নাই, বিরোধ নাই, সংঘর্ষ নাই। এখন জ্যোতির্ম্ময়ের মহা জ্যোতিতে বিশ্বমানবত্বের উদয় হইয়াছে। বিশ্ব-মানবে প্রকটিত মহেশ্বরের মহা ইচ্ছার অপূর্ব্ব জ্যোতি।

ইচ্ছা-যোগের কথা বলিতেছি যখন, তখন

কেহ মনে করিবেন না, আমরা পাপের সহ সন্ধি করিতে বলিতেছি। পাপকে নিত্য জয় করিতে হইবে। পাপ পরাজিত না হইলে, বাসনার অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলে, মহেশ্বরের মহা ইচ্ছা বুঝা বড় কঠিন। নিবিতে নিবিতে নিবিতে যখন পাপ ধ্বংস, বাসনা ধ্বংস, কামনা ধ্বংস,—অথবা রিপুকে যখন বলি দেওয়া হইয়াছে, তখনই মহা ইচ্ছার সহিত মানবের একীকরণ হয়। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য, ইচ্ছার বিরোধ তখন আর থাকে না। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিলোপ হইলে, পুত্র যাহা চায়, পিতা তাহাই দেন। সাধক তখন যাহা চান, বিশ্বেশ্বর তখন তাহাই বিধান করেন। সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক —সকল প্রার্থনাই তখন পরিপূর্ণ হয়। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম তখন একাকার, ভিতর বাহির তখন সম-অবস্থাপন্ন,—ভক্ত জর্জমুলার টাকা চাহিলে, বিধাতা তখন টাকা দেন, খ্রীষ্ট রুটী চাহিলে তিনি রুটী পান; কেশবচন্দ্র ভক্তি চাহিলে ভক্তি পান; রামকৃষ্ণ কৈবল্য চাহিলে কৈবল্য লাভ করেন। "প্রার্থনা" পূর্ণ হয় না, যে বলে, সে কখনও ইচ্ছা-যোগ-সাগরে নিমগ্ন হয় নাই। নিত্য নৈমিত্তিক প্রার্থনাও যে পূর্ণ হয়, মহা সাধকগণ তাহা স্বীকার করেন। নিত্য প্রত্যক্ষ কথা অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করিতে পারে, ভক্তেরা পারেন না। ইচ্ছা-যোগ-সাধনের মহা শাস্ত্র সরল প্রার্থনা। প্রার্থনাই মুক্তি এবং কৈবল্য প্রাপ্তির মহা উপায়।

বিশ্বরাজ্যের বিশ্বমানবত্বে বিশ্বেশ্বরের অভিব্যক্তি। বিশ্বমানবের সহিত ইচ্ছা-যোগ-সাধন হইলেই বিশ্বেশ্বরের সহিত ইচ্ছা-যোগ সাধিত হয় এবং পিতা পুত্রের মিলন হয়। সংযম, নিবৃত্তি, নিষ্ঠা ইচ্ছা-যোগ সাধনের সোপান এবং প্রার্থনা মূল মন্ত্র। এই সকল অবলম্বন করিলেই কৈবল্যে পৌছান যায়। অন্য পথ নাই, অন্য উপায় নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বন্দনা।

(১)

আমার তুমি, আমার তুমি,
অয়ি আমার জনম-ভূমি,
আমিও মাগো, একেলা শুধু তোমারি!
না জানি কোন্ পরম ক্ষণে,
মিশিনু মোরা পরাণ-মনে,
নিখিল ভবে হইয়ে দোঁহে দোঁহারি।

(২)

তোমার চারু ফুলের বনে,
পাখীরা ভাসে কাহার সনে,
সমীর ফিরে বিটপী-লতা দুল্যায়ে;—
আমার মাগো, হিয়ায় জাগে,
ডাকিছ মোরে সবার আগে,
বিষাদ-ব্যথা সকল-কিছু ভুলায়ে!

(৩)

গগন ভরা কিরণ-মেলা,
দিবস-নিশি সারাটী বেলা,
আমারি সাথে করিছে খেলা কতরে!—
সবার মাঝে লুকায়ে নিজে,
তুষিছ তুমি আমারে কি যে,
পাগল-করা বচন-ভরা আদরে!

(৪)

নদী সে কয় আমায় কাণে,
"জননী তোরে ভালরে জানে,
অধর্ম বলে যতন তোরে বেশীরে!"
চরণ তলে লুটায়ে ধূলি,
শুনায় কভু একিগো বুলি,
"ওরে, আমার তুই আপন-দেশীরে।"

(৫)

শোভার মাঝে, সুখের মাঝে,
ডুবায়ে মোরে সকাল-সাঁঝে,
তুমি তো মাগো, দিয়েছ ধরা আমারে!
এত যে হাসি, এত যে গান,
করে না তোমা পুলক দান,
তুমি মা, যেন ভাবিছ সদা আঁধারে!

(৬)

হারাল তব যেন কি নিধি,
তাহারি তরে কাঁদিছে হৃদি,—

জননি, মোরে করোনা আর ছলনা।
কাড়িয়ে লও চরমরাশি,
টুটিয়ে দাও মোহন বাঁশী,
জাগায়ে দাও সারাটা বুকে চেতনা।

(৭)

হারাণ-নিধি কেমন হয়,
কোথা সে আছে গোপন রয়,
হেরিব তাই জীবন-পণে তলাসি'।
রেখোনা মোরে রেখোনা বাঁধি'
করুণ-চোকে চেয়োনা কাঁদি'
বিদায় কর সাজায়ে মোরে উদাসী।

(৮)

দেবের দেব আশীষ সাথে,
আশীস তব পড়ুক মাথে,
রাঙাপায়ে ভরে বিছুরি আর কামনা।
তোমার মাগো, কোমল বুকে'
ঘুমাব আমি আরাম সুখে,
সফল যবে হইবে মম সাধনা।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অসহায়।

হে নিঠুর প্রাণ সখা, এ কেমন খেলা।
কোলাহল মাঝে মোরে ফেলিয়া একেলা
কোথা গেলে তুমি? অসহায় আমি হেথা
উদ্বিগ্ন-আগ্রহ-ক্ষুব্ধ লয়ে' রুদ্ধ-ব্যথা
উদ্ভ্রান্ত নয়নে চাহি সবাকার পানে,
কেহ মোরে বোঝে না তো! শ্লেষ-বাক্য-বাণে
বেদনা জাগায় আরো। কাহারে জিজ্ঞাসি?
কেবা বলে দেবে? শুধু উঠিছে নিঃশ্বাসি'
নিঃসঙ্গ প্রাণের মৌন দিগন্ত-আর্ত্তনাদ,
ফুকারি' কাঁদিতে নারি এ'ক পরমাদ।
আপনারে লয়ে' ব্যস্ত সবে হেথাকার,
সুধা'লনা কেহ মোরে কি দুঃখ আমার।
এবে কি বুঝিব মোরে তুমিও ছেড়েছ?
এবি তবে হে চতুর হেথায় এনেছ?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

উর্ম্মী।

উর্ম্মী তব শুষ্ক হৃদে যবে আসে বাণ.
পরিপূর্ণ সর্ব্ব অঙ্গ, পূর্ণ হৃদিখান;
আবেগে নিমেষে হায়,
তৃণ কুটা ভেসে যায়,
পোড়া-কাঠ ও অঙ্গার ক্ষণে অপসৃত,
কাদা মাটী ক্রমে ত্যাজি হবে পরিষ্কৃত,
হবে স্বচ্ছ সুবিমল
প্রশমিত বক্ষস্থল,
প্রপাতে বহিয়া নীর ফেনিল সুন্দর,
পাষাণ হৃদয় মাঝে দেখিবে অন্তর।
বালুকা-পাষাণময়
চির শুষ্ক কেবা রয়?
বালুময় পরিশুষ্ক বাহির যাহার,
অন্তস্থল একবার খুঁজে দেখ তার;—
সেথা বহে স্বচ্ছ নীর,
পিপাসার যে অধীর,
তার করে তৃষা দূর সরস হৃদয়,
উর্ম্মী তব শুষ্ক হৃদি পরিশুষ্ক নয়।
সেথান পাষাণময়,
ঝরণা সেথানে রয়,
কবি অনিমেষে চাহি থাকে যে বিহ্বল,
প্রকৃতি গম্ভীর, আসে ভক্ত চ'খে জল,
তব তীরে বাস করি,
উর্ম্মী আমি মনে করি,
কে যে উপমেয়, আর কে যে উপমান,
তুমি আমি দুই জনে সমানে সমান,
যখন আসিবে বাণ,
শুষ্ক হৃদি দুইখান,
বাহিবেও পরিম্লান না রবে কখন,
তরুলতা আসে পাশে পাইবে জীবন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শ্রীপঞ্চমী।

মঞ্জু-মালতী মধুমুঞ্জরিত খণ্ড-চন্দ্র কিরণে,
চূত মুকুল গন্ধ বহিছে নির্ম্মল-চল-পবনে।
মম মন্দির মন্দার গন্ধ-মোদিত অন্ধ হৃদয় নন্দনে,
উর শ্বেতবরণা শান্তনয়না,শেফালী-শুভ্র বরণে।
অমল অতসী, কুমুদ, কুন্দ, অরুণ-পূত প্রসূনে,
চর্চ্চি চূয়া চন্দনে ইন্দু কিরণ নিন্দিত চারু-চরণে।
মত্ত মধুপ গুঞ্জন রত কোকিল-কুজিত কুঞ্জ,
পঞ্চম ললিত তান-লহরী তুলিছে পাপিয়াপুঞ্জ;

কনক মঞ্জীরে উঠিছে বাজি মধুমঙ্গল রাগিণী,
কোবিদ কুল কলাপী কণ্ঠে, বন্দিছে যুগপাণি।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

পাখীর গান।

(১)

ভুবনের সুখ দুখ এ ভুবনে দিয়ে বিসর্জ্জন,
ছুটিয়াছি নীল রাজ্যে, লয়ে মোর সারাটা অন্তর
পৃথিবীর মধুরতা পৃথি তলে করি সুখে দান—
চলিয়াছি দেব-পদে উৎসর্গিতে এ ক্ষুদ্র পরাণ।

(২)

উঠিতেছে রাঙ্গা রবি, আঁকি' ছবি নন্দন বনের।
কি মধুর বায়ুময় দুঃখশূন্য অনন্ত আগার।
তারকার দেশ এ যে দেবতার প্রেমনিকেতন—
সাধিবার স্থান অহো। শান্তিময় অনন্ত অপার।

(৩)

নাহি আসে ফুলবাস নাহি হেথা পাপিয়ার স্বন।
নাহি হেথা মরতের দুঃখ ভরা তপ্ত হা-হুতাশ।
নাহি জন্ম। নাহি মৃত্যু। এই স্থান পবিত্র মহান্ -
স্বরগের শান্তি ভরা বহে হেথা মৃদুল বাতাস।

(৪)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড এ আকাশে নির্ম্মল উদার—
দেবতার আশীর্ব্বাদ বহে যায় বায়ুর প্রদেশে,
গাহি গান হেথা আমি খুলি মোর সারাটা পরাণ
নীরদের সনে আর পবনের সনে ভেসে ভেসে।

(৫)

হেথা কভু জলে উঠে ত্রিদিবের কালান্ত অনল।
বজ্র কভু ভেঙ্গে পড়ে হেথা হ'তে মানব শিয়রে।
হেথা হতে পড়ে কভু দেবতার তপ্ত আঁখিজল।
যখন ভুবন রাজ্য পাপে অবনত হয়ে পড়ে।

(৬)

হেথায় গাহিয়া যায় রবি তার স্বর্ণ-রথোপরে,
শশী দেব হাসে হেথা ভরি' বুক দীপ্ত জোৎস্নায়।
ফুটে লক্ষ লক্ষ তারা হাসি লয়ে কনক অধরে।
নীহারিকা মৃদু হাসি মৃদু মৃদু লুকি লুকি চায়।

(৭)

থাকেনা অহং ভাব এই মহা বায়ুর সাগরে,
নাহি থাকে বৈভবের প্রাণহারী কুটিল ভঙ্গিমা।
হেথা আছে প্রকৃতির মৃদু হাসি সুনীল অধরে,
দুঃখ নাই, আছে হেথা ত্রিদিবের অনন্ত মহিমা।

(৮)

যখন আকাশ রাজ্য ছেড়ে আমি আবার চলে যাই,
ধারার হৃদয় খানি দেখিবারে হইয়া উৎসুক।
শশীর প্রশান্ত মূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে অতি ধীরে
ইঙ্গিতে আমারে ডাকে লভিবারে ও বক্ষত বুক।

(৯)

কিন্তু হায় পক্ষ মোর ক্ষুদ্র অতি, অতীব নির্ব্বল,
তাই পুনঃ চলে আসি ধীরে ধীরে কুলায়ে আমার।
দুঃখময় রাজ্য মাঝে ত্যজি যত হরষ সঙ্গীত—
লুকাতে শাবক গুলি বক্ষ মাঝে,আসিলে আঁধার!

শ্রীমতিলাল রায়।

প্রার্থনা।

আমি আকুল অন্তরে, দয়াময় হরি,
এসেছি তোমার দ্বারে।
দীন অভাজন বলে করিওনা হেলা,
পায়ে ঠেলনা আমারে॥
বহু দিন হ'তে, অতৃপ্ত বাসনা হৃদে,
করিয়া পোষণ হরি।
আমি চলেছিনু ঘোর, সংসারের পথে,
আত্ম-পরিজনে স্মরি॥
কিন্তু তাহে নাথ, দারুণ পিপাসা-আশা,
মোর মিটিল না হায়।
তুমি দীনবন্ধু—কবি দীন জনে দয়া,
রাখ মোরে রাঙ্গা পায়॥
আমি অজ্ঞান-আঁধারে ছিলাম ডুবিয়ে,
বিষয় বাসনা নিয়ে।
আগে ভাবি নাই কভু—কালের তাড়নে,
যা'বে সকলি ভাসিয়ে॥
অনিত্যে মজিয়া হায়। দেখি নাই চাহি'
এমনি মায়ার ঘোর।
নিজ গুণে তুমি হরি নিত্য বিরাজিছ,
মানস-মন্দিরে মোর॥
এবে খুলিয়াছে আঁখি—বুঝিয়াছি সব,
দুঃখ ভরা এ সংসার।
স্বার্থপূর্ণ নর নারী—আত্মীয় স্বজন,
দুঃখে কেহ নহে কা'র॥
মোর ফুরায়েছে সব সংসারের আশা,
কিছু নাহি চাই আর।

শুধু মিনতি হে প্রভু! অন্তে যেন পাই,—
রাঙ্গা চরণ তোমার॥
শ্রীআনন্দ-গোপাল ঘোষ।

কিশোরী ঊষা।

এত ভোরে স্নান করে লো চুলালী মেয়ে
কোথা হতে আ'লি?
কুহেলি-ওড়না গায়ে, হাতে তোর একি?—
আবিরের থালি।
গগনের নগ্ন অঙ্গ, করে দিলি রাঙা
মুটি মুটি ফাগে,
কুঙ্কুম ছড়ায়ে দিলি নীল সিন্ধু নীরে—
ঘন অনুরাগে!
নীহারের হীরাহারে রঞ্জিল কে তোর
কনক কুন্তল,
রক্তপদে কেবা দিল অরুণ-অঞ্জলি?—
জবা-শতদল।
কোন্ সুর-সুন্দরীর সীঁথির সিন্দুর
লেপিলি ললাটে,
নিশিশেষে কে উর্ব্বশী ধুইলা চরণ
পুর্ব্বাশার ঘাটে?
স্নিগ্ধধীর সমীরের অমিয় পরশে
জাগালি জগৎ,
গাছে গাছে এক সাথে দিলি বাজাইয়া
খগনহবৎ।—
টিকাড়া পিটায়ে কাক ঘোষে বনে বনে
তব আগমনী,
রাম শিঙা ফুকারিয়া কহে ঘামঘোষ—
"যায় যে যামিনী"
কোন্ যাদুমন্ত্রবলে সুপ্ত বসুন্ধরে
দিলি জাগরণ—
লতায় লাবণি, মৌন মুকুলে পুলক—
শষ্পে শিহরণ।
কার সঙে হোল খেলে—কহলো কিশোরি!
হলি লালে লাল।
মেঘের নিকুঞ্জে কিগো বাঁশরী বাজায়
নন্দের চুলাল?
শ্রীকুলচন্দ্র দে।

লিপী।

যে কাহিনী কহিবারে নব-জিহ্বা হয় গো স্তম্ভিত,
ছিন্ন হয় মর্ম্মগ্রন্থি যে সম্বাদ করিতে প্রচার,
যে কথা পশিয়া কর্ণে বজ্রদগ্ধ করে দেয় প্রাণ,
তুমি এস কালামুখি, বক্ষে লয়ে সেই সমাচার!

সুখ-বসন্তের মাঝে আন তুমি বর্ষার ক্রন্দন,
হাসিরাশী-রাকাশশী ঢাকা শোক-ঘন আচ্ছাদনে,
ক্ষতচিত্ত করে দাও চিরতরে বিষময় তুমি,
অকস্মাৎ সর্ব্বনাশি, লয়ে এস কত দুর্ঘটন!

কভু সঙ্গে আন তুমি নন্দনের মলয় হিল্লোলে
উষায় কুসুম-চ্যুত গুনহীন কণিকার সম
কত আশীর্ব্বাদ, কত স্নেহের চুম্বন দিয়ে তুমি
পুলক প্রীতির ধারা সর্ব্ব সঙ্গে ঢেলে দাও মম!
উদ্দাম প্রণয়-গীতে কভু তুমি কর আত্মহারা,
জগতের মঙ্গল সংগীত আছে বালা, তব চিত্তভরা॥
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

(১১ই মাঘ। ১৩১৯)

(১)

হান দয়াময় কুলিশ তোমার বক্ষঃ দিয়াছি পাতিয়া,
পাপের পসরা কর চুরমার, রক্ষ আমাকে শাসিয়া,
কলুষের রাশি বাড়াও না আর, লক্ষ অপরাধ ক্ষমিয়া,
বিলাস-সাগরে রেখনা ডুবায়ে সারাটী জীবন ধরিয়া,
প্রায়শ্চিত্ত-পূত জীবন আমার আপনার দৈন্য বুঝিয়া
আজিকে উঠুক কাঁদি দয়াময় তোমার আহ্বান শুনিয়া।

(২)

তব নাম গানে হৃদয় আমার আজিকে উঠুক নাচিয়া,
সারাটী পরাণ উঠুক আজিকে জগতের প্রেমে মাতিয়া,
এ নিখিল বিশ্ব আমার নিকটে জাগুক আজিকে হাসিয়া,
পাপ, পরিতাপ, দুঃখ, দৈন্য যাক অশ্রু প্রবাহে ভাসিয়া,
নব আলোকের অরুণ কিরণে ভবিষ্য জীবন রাঙ্গিয়া
উঠুক আজিকে, অলস নিদ্রার স্বপ্ন মোহ যাক ভাঙ্গিয়া,
ভক্তির কজ্জলে লিপ্ত হ'ক আঁখি, কালিমা পড়ুক ঝরিয়া
শান্তি হোমানলে পতঙ্গের মত রিপুদল যাক মরিয়া।
তোমার আশীষ, তোমার করুণা মরণ অবধি লভিয়া
তব নাম, নাথ, গাহিতে গাহিতে যেতে পারি যেন চলিয়া।
শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৬৬। তপস্যার ফল। (কথা-গ্রন্থ) শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য আট আনা। ইহাতে বিলাত-ফেরত ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কোর্টশিপের একটী অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। কি ভাষার পারিপাট্যে, কি রচনার নিপুণতায়, কি ভাবের সামঞ্জস্যে, কি বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্দ্রজাল ক্রীড়া করে। এ গ্রন্থ তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। গল্পের ছত্রে ছত্রে রসিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি চিত্রিতচরিত্র সকলের প্রাণের অন্তরালে যাইয়া ঘটনার আবর্ত্তনে আলো ও ছায়ার ন্যায় পরিবর্ত্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিন্তাতরঙ্গগুলি স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। বিলাত ফেরত সমাজে, ব্রাহ্ম না হইয়াও, রায় পরিবারের আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজে সুশীলচন্দ্রের ন্যায় যুবক ও হিন্দুসমাজের পণ্ডিত মহাশয়কে চিত্রিত করিয়া বিজয় বাবু দেখাইয়াছেন, তিনি নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী। পক্ষান্তরে মিঃ 'ন্যাণ্ডির' ভগবানের প্রতি বিদ্রূপ, প্রফেসর ব্যানার্জির গাড়োয়ান ও পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার, ভোলানাথ বাবুর পেটে কথা না থাকা ও গান গাইবার জন্য কণ্ঠকণ্ডূয়ন, টীমারে ডুবিয়া মরিবার ভয়, আহারের ক্লেশের ভাবনা ও প্রচারক না হইয়াও অতিরিক্ত ধর্ম্মপ্রচারের তেজ এবং মেরী বাউরীর বাইবেল-জ্ঞান বেশ উপভোগযোগ্য ও মানান-সই মার্জ্জিত শ্লেষ।

'সে কি মশাই? এ জিনিষ ত ব্রহ্মের মত নির্গুণ ও ঘোরাটে'—নন্দীর এই মন্তব্য শুনিয়া সুশীলচন্দ্রের হো হো করিয়া হাসিয়া উঠা কেমন অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 'যাঁহারা বিবাহ দিতে চাহেন, তাঁহারা কি সুশীলাকে গৃহ হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে চান? এ গৃহ কি তবে সুশীলার নয়? সুশীলা রাগ করিয়া নিভৃতে গিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।' বি-এ পাস করা ২০ বর্ষীয়া কন্যার সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য নিতান্ত অস্বাভাবিক ও লোকচরিত্রের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

এম এ, পাশ করা সুশীলচন্দ্র যে ভাবে বিবাহ প্রস্তাব করিয়া গ্রন্থ শেষ করিলেন, তাহা আপত্তিজনক। সুশীলার জননী তাহাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে রায় সাহেব ও তাঁহার পত্নীর মতামত না জানিয়া সুশীলার নিকট 'তপস্যার ফল' বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার এবং রীতিমত প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া হঠাৎ 'নীলডাউন' হইয়া ভাবী শাশুড়ীর বিছানার পার্শ্বে যাইয়া 'মা আমি ছেলে হব' বলিবার অধিকার সুশীলচন্দ্রের নাই। এই সম্পূর্ণ বিলাতী-ইংরাজী চিত্র আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া বিজয় বাবু আদর্শ মলিন করিয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য খর্ব্ব করিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষ অংশ বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া যাইবার মতন যেন হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে।

৬৭। 'এষা'। (গীতিকাব্য) শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল প্রণীত। আজকাল বঙ্গসাহিত্যে গীতিকাব্যে বড়াল কবির কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন বলিয়া জানি না। তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল, নির্দ্দোষ, কোমল, সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। কথাগুলি যেন প্রকৃতি একটী একটী করিয়া স্বয়ং গণিয়া বাছিয়া ভাবের খরস্রোতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কবি ব্যক্ত ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার শতগুণ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন একটী শব্দও নিরর্থক বা অনাবশ্যক নাই। এমন প্রাণ ঢালিয়া ভাবের ভাণ্ডার পাঠকের উপভোগের জন্য কে খুলিয়া দিতে পারে? কবিকুলগুরু কালিদাসের ন্যায় আপনি মজিয়া পরকে কে এমন মজাইতে পারে? কবির কাতরধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনি করিবার পূর্ব্বেই হৃদয়ে আঘাত করে। কাব্যকাননে

মালা গাঁথিয়াছেন অনেকেই, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ন্যায় শিল্পী ক'জন আছেন?

সুকবি অক্ষয় কুমার মঙ্গল'প্রদীপ' জ্বালিয়া, 'শঙ্খ' বাজাইয়া যে মহাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন, 'এষা' তাহার ধ্যান। এষা সংস্কৃত শব্দ, ইংরাজী 'In memorium'এর রাঙ্গসংস্করণ। অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করিবে, এই আশায় কবি এই অপূর্ব্ব রত্ন বৈদিক সাহিত্য-খনি হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গভাষাকে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গালী এই অপরিচিত শব্দ গ্রহণ করিবে কিনা, জানি না। নাইটিঙ্গেল যেমন কণ্টকে কণ্ঠ রাখিয়া কাতর সঙ্গীতে ব্যোমমার্গ পূর্ণ করে, আমাদের আদরের কবি অক্ষয়কুমার সেইরূপ মেঘপারে কি যেন কি বিষাদের ছবি দেখিয়া ছল ছল নয়নে যে শোক গাথা গাহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ক্ষতে যে রক্তধারা ঝরিয়াছে, তাহা পাঠকের পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত করিবে। কবি কান্দিয়া ধন্য হইয়াছেন, সে কান্নায় যোগ দিতে পারিলে বাঙ্গালী পাঠক ধন্য হইবেন।

৬৮। গোলাপগুচ্ছ।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা ১৲। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। এই সুবৃহৎ পুস্তকে ৭৩টী বাঙ্গালা এবং ১২টী ইংরাজী কবিতা আছে। গ্রন্থ খানি কবি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

৬৯। অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল, ঐ প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা ৷৷০। এই একশত পৃষ্ঠায় নাতিবৃহৎ গ্রন্থেও বহু কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

৭০। অশোকগুচ্ছ—ঐ প্রণীত। (২য় সংস্করণ)। মূল্য কাগজে বাঁধা ১৲। ইহা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এ পুস্তকে ক্ষুদ্র বৃহৎ ৫৫টী বাঙ্গালা এবং ১৫টী ইংরাজী কবিতা আছে।

৭১। সেফালীগুচ্ছ—ঐ প্রণীত। মূল্য ৸০। ইহাতে ৬২টী বাঙ্গালা এবং ১৩টী ইংরাজী কবিতা আছে। এ গ্রন্থ সুকবি মিঃ ডি, এল রায়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

৭২। পারিজাতগুচ্ছ—ঐ প্রণীত, মূল্য ১৲। ইহাতে ৫৮টী বাঙ্গালা এবং ২৭টী ইংরাজী কবিতা আছে। এ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

৭৩। অপূর্ব্ব নৈবেদ্য—ঐ প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা ৸০। ইহা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহাতে ৭৩টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা আছে।

৭৪। অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা—ঐ প্রণীত। এ পুস্তক শ্রীযুক্ত রসময় লাহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহা বন্দনা ব্যতীত ৪টী বৃহৎ কবিতার সমষ্টি।

৭৫। অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা—ঐ প্রণীত। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ৯টী কবিতার সমাবেশ রহিয়াছে।

৭৬। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—ঐ প্রণীত। মূল্য ৵০। এই পুস্তিকা শ্রীযুক্ত শশী (?) পদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

৭৭। জ্ঞানদামঙ্গল—ঐ প্রণীত। মূল্য ৵০। ইহাতে ১৩ পৃষ্ঠার ১টী মাত্র কবিতা আছে।

দেবেন্দ্র বাবুর অসাধারণ লিখিবার শক্তি আছে। তাঁহার শব্দভাণ্ডার ও ভাষাপ্রবাহ প্রশংসনীয়। এই একরাশি পুস্তকের নাম ও আয়তন হইতে পাঠক ইহার সারবত্তা বিচার করিবেন। সেন কবি ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অভাব মোচন করিতে পারিবেন, আশা করা যায়। তাঁহার কোন কোন কবিতা এত সুন্দর যে, তাহা যে কোন কবিকে লজ্জিত করিতে পারে। তাঁহার লেখনী একটু সংযত হইলে ভাল হয়।

"কবি তাঁহার কোনো বিশ্বনিন্দুক সমালোচকের প্রতি" কবিতায় বলিয়াছেন:—

শর্করার প্রতি তব কেন এত রোষ?
শর্করার দোষ নয়,—রসনার দোষ!
বিশ্বচক্ষে যেইপদ্ম মধুর মধুরা,
সেই লাবণ্যের পুষ্পে হেরিছ ধুতুরা!"

৭৮। দেবেন্দ্রমঙ্গল।—শ্রীমোহিতমোহন মজুমদার প্রণীত, মূল্য ৵০। এই ১৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকার কবিতায় লেখক কবি দেবেন্দ্রনাথের এইরূপ স্তুতি করিয়াছেন—

সার্থক সাধনা তব, হে কবি প্রবীণ,
রূপপূজা-পুরোহিত তুমি মহাব্রতী।
চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ,
তাই দেব করিলাম তোমার আরতি।

৭৯। উৎসব। শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বরিশাল হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০। "উৎসবের বক্তব্য বিষয় রূপকচ্ছলে লিখিত।" শ্রীযুক্ত সারদাবাবু তাঁহার লিখিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'ইহা আমাদের উচ্চ শ্রেণীর খণ্ড নাটক মধ্যে পরিগণিত হইবে।' আমরা একথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। গ্রন্থকার কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহার রচনা মধুর ও স্বাভাবিক, ভাষা নির্দ্দোষ ও ভাবসম্পদ-বিশিষ্ট।

৮০। Third Annual Report of the Workingman's Institution 93/1 Baitakkhana Road, Calcutta.

জনসেবা মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য। বুভুক্ষিতকে অন্ন দান করা, রুগ্নকে ঔষধ দান করা, অজ্ঞান ও অশিক্ষিতকে সুশিক্ষিত করাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। নিম্নশ্রেণীকে উন্নত করিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে আমাদের কষ্টলব্ধ শিক্ষার ফল বিলাইয়া দিতে হইবে, তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয় লইয়া মিলিয়া মিশিয়া ভাবের আদান প্রদান করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের মঙ্গল কোথায়? দেখিয়া সুখী হইলাম, এই শ্রমজীবি-শিক্ষা-সমিতি তিন বৎসর জীবিত থাকিয়া নরসেবা-ব্রত পালন করিয়া ধন্য হইতেছেন।

৮১। মাণিকতলা শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ১৯১১-১২। সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। মোট ছাত্র সংখ্যা ২৭।

৮২। Popular Education Report of the Central Commitee of workingman's institutiou. এই সাধু অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে কোন প্রশংসাই অতিরিক্ত বিবেচিত হইতে পাবে না। আমরা ইহার প্রতি সাধারণের সাহায্য, সানুভূতি ও কৃপা-দৃষ্টি এবং বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

৮৩। জাতীয়-বিধান—বিধানধাণী। সেবকের নিবেদনের নূতন পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। এক ফর্ম্মার পুস্তিকা সার-বান উপদেশে পরিপূর্ণ।

৮৪। লক্ষ্মণ। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-প্রণীত। মূল্য ।০। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অব-লম্বনে লিখিত। এই ২৬ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তি-কায় ভ্রান্তি, অনবধানতা ও ভাষা-দোষ না থাকিলেই ভাল হইত। বিষয় ভাল, রুচি মার্জ্জিত।

৮৫। জয়দ্রথ-সংহার (দৃশ্যকাব্য)—উমেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকা-শিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ৯৲। এই পৌরাণিক কাব্য নানা ছন্দে রচিত। ছন্দ ও ভাষা গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অধীন। তাঁহার লেখনীমুখে শব্দপ্রবাহ যেন আপনা আপনি ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকে যে সকল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইল, তজ্জন্য গ্রন্থ-কার যে কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট।

৮৬। রাজতপস্বিনী বা মহারাণী শরৎ-সুন্দরী দেবীর জীবনী প্রসঙ্গ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য সুন্দর রেশমী কাপড়ে বাঁধা ১৲। এই পুস্তক সরল প্রাঞ্জল ভাষায় জীবন স্মৃতি হইতে সংগৃহীত কতক-গুলি ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ। পুণ্য-শ্লোকা মহারাণী শরৎসুন্দরী দয়াগুণে ও চরিত্র-মাধুর্য্যে বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিতা। তাঁহার আদর্শ জীবনের পুণ্যকাহিনী জাহ্নবী-ধারার ন্যায় পবিত্র। লেখক বাল্যস্মৃতি হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক সময় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, প্রীতিকর এবং অপ্রীতিকর ভাব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে মহারাণীর ভবিষ্যৎ জীবনীকার প্রচুর উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন।

৮৭। পারিজাত, কবিতা পুস্তক। শ্রীহবিবর রহমান বিরচিত। মূল্য ৷৶০। হিন্দু মুসলমান উভয়েই জননী বঙ্গভাষার সন্তান। মুসলমান লেখকগণ মাতৃভাষার সেবা করিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আনন্দ হয়। বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

৮৮। হিন্দুধর্ম্ম। বিবিধ হিন্দুশাস্ত্র হইতে উপাসনা-তত্ত্ব সম্বন্ধে সার-সংগ্রহ। অনৈক ভক্ত হিন্দু কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ।৵০

এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ গবেষণাপূর্ণ ধর্ম্ম-গ্রন্থ এ দেশে বড় অধিক দেখা যায় না। হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনে ইহা উদ্ধৃত। ঘরে ঘরে এই পুস্তকের প্রচার হইলে আমরা সুখী হইব।

৮৯। সন্তানের চরিত্র গঠন, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, প্রণীত। মূল্য ॥০। বঙ্গ ভাষার শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা অতি বিরল। অথচ আমাদের এইরূপ পুস্তকেরই প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কয়েক জন প্রধান প্রধান শিক্ষাতত্ত্ববিদের মতের মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভাষা আরও মার্জ্জিত ও সহজবোধ্য হইলে ভাল হইত। আমরা প্রত্যেক জনক জননী ও অভিভাবককে এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৯০। আহ্লাদে আটখানা, অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। মূল্য ।৵০। শিশু সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজকাল অনেকেই কর্ষণ করিতেছেন। নানা শিশু-পাঠ্য ভূতপ্রেতের গল্পের জ্বালায় আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্থানীয় বালক বালিকারা অস্থির। কিন্তু কৃতিবিদ্য শিক্ষক ও সুলেখক ললিতকুমারের মস্তিষ্ক ও লেখনী এক্ষেত্রে নিযুক্ত দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। তাঁহার প্রতিভা, বহুদর্শিতা, ও অগাধ পাণ্ডিত্য যে সুফল প্রসব করিবে, তাহা অমূল্য। ইসপস কেবলস্ পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের ছায়া লইয়া রচিত, তাহারই কয়েকটী গল্প সুন্দর, সরল, মধুর ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ছাপা, ছবি, কাগজ সবই মনোহর। এ বই পড়িলে কেবল শিশুরা কেন, বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত আহ্লাদে আটখানা হইবে।

৯১। সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক ওড়িয়া হইতে ভাষান্তরিত। বামড়ার করদরাজ শ্রীসচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব রচিত ১২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওড়িয়া কবিতার বঙ্গানুবাদ। আমরা মূলের মাধুর্য্য সম্ভোগে বঞ্চিত হইলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রাজা সচ্চিদানন্দ লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও সরস্বতীর বিশেষ অনুকম্পা ও আদরের পাত্র। কবিতাগুলি স্থানে স্থানে এত সুন্দর হইয়াছে যে, তাহা যে কোন ভাষার গৌরবের সামগ্রী। জানি না, ইহা নূতন কবির রচনার গুণে, না অনুবাদক প্রতিভাশালী কবি বিজয়চন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে।

৯২। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ, শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি-এ, প্রণীত। মূল্য ।৵০। ছাপা, কাগজ, ছবি সুন্দর। পূর্ব্বস্থলীর ঠাকুর সচ্চিদানন্দের সিদ্ধিলাভ-কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গে আপামর সাধারণের নিকট সুপরিচিত। সংস্কৃতে সর্ব্বানন্দ-তরঙ্গিণীতেও সে কথা লিপিবদ্ধ আছে। লেখক কথোপকথনের ভাষায় তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও এরূপ গ্রন্থ বাজারের অনেক বাজে শিশুপাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা বালক বালিকাদিগের অধিকতর উপযোগী, সন্দেহ নাই। আমরা এই নূতন লেখককে সানন্দে সাহিত্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি।

৯৩। তপতী (নাট্যকাব্য)—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল, প্রণীত। মূল্য ১৲। কবির লিখিবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার লেখনীতে সতেজ, সরল, অবাধ অথচ সংযত ভাব ভাষায় সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। আজকাল কবিতা পুস্তকের নাম শুনিলেই তাহা অপাঠ্য সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু এ পুস্তকে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে। ইহা উপন্যাসের ন্যায় মুখরোচক।

৯৪। সঙ্গীত-লহরী, শ্রীহরিদাস মিত্র রচিত। মূল্য ॥০। গানগুলি বেশ হইয়াছে, অনেক স্থলে সাধক রামপ্রসাদের ও কাঙ্গাল হরিনাথের ধ্বনি বুঝিতে পারা যায়।

স্থানাভাবে অন্যান্য সমালোচনা গেল না, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

প্রসাদী ফুল। (৭)

ভক্তি ও ভক্ত।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথর-প্রতিভা-সম্পন্ন নায়ক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আপনার সাধকমণ্ডলী হইতে দুইজনকে বাছিয়া লইয়া বিশেষ ভাবে ভক্তি ও যোগ-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীগুরুদেব (গোঁসাইজী), অন্য জন সাধু অঘোরনাথ। একথা বলা বাহুল্য যে, কেশবচন্দ্র যে পথে এই সাধকদ্বয়কে পরিচালিত করিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই স্ব-কপোল-কল্পিত-পথ, কোন ঋষি-প্রবর্ত্তিত পরীক্ষিত প্রাচীন পন্থ নহে। এই ভক্তি ও যোগ পথের পথিকদ্বয় একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সংযম ও ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে স্ব স্ব পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলেন। ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সাধকদ্বয়কে যথা ক্রমে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "তোমরা আজ ভক্তি ও যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া গোঁসাইজীর মনে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তিনি বৈষ্ণব-সন্তান, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশধর, বাল্যকাল হইতে ভক্তির ও ভক্তের লক্ষণ শুনিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণ এই অবস্থায় তিনি কিরূপে আপনাকে "ভক্তি-সিদ্ধ" বলিয়া মনে করিবেন? তিনি কেশবচন্দ্রকে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সত্য-গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। যেরূপ লোকেরা আপনার সংকীর্ণ-গণ্ডীর বাহিরের কোন বস্তু গ্রহণ করিতে ভীত হয়, তিনি সেরূপ লোক ছিলেন না, তাঁহার সিংহের ন্যায় বিক্রম ছিল, আপনার অপ্রতিহত গতির জন্য তিনি কোন বাধা মানিতেন না। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না, সুতরাং নূতন কথা শুনিতে কি নূতন পথে চলিতে তিনি কখনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। গোঁসাইজী যখন কেশবচন্দ্রকে মনের কথা বলিতে লাগিলেন, তিনি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ পূর্ব্বক সমস্ত শুনিলেন।

গোঁসাইজী যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ণিত আছে,—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আশক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুঃ জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহাতে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতে, আটটী গুণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইবে, আটটী গুণ যথা,—

১। ক্ষমা। ২। অব্যর্থকালত্ব। ৩। বৈরাগ্য। ৪। মানশূন্যতা। ৫। আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা। ৬। নামগানে সদারুচি। ৭। তাঁহার (ভগবানের) গুণগানে আসক্তি। ৮। তাঁহার বসতি স্থানে প্রীতি।

১ম ক্ষমা। তিনি (যাঁহাতে ভক্তির অঙ্কুর জন্মিয়াছে) বৃক্ষের ন্যায় ক্ষমাশীল হইবেন। পথিকগণ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গে,

ফল পাড়িয়া খায়, তথাপি বৃক্ষ আপনার ছায়া ও আশ্রয় দানে পথিককে বঞ্চিত করেনা।

আমরা কি ক্ষমা করিতে শিখিয়াছি? যদি আপনি আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট করেন, অথবা একটী লোকের নিকট কোন ব্যাপার লইয়া বিন্দুমাত্র নিন্দা করেন, আপনার আকৃতিটী আমার নিকট মলিন হইয়া যাইবে, আপনার শত প্রকারের গুণ থাকিলেও আমি আর প্রাণ খুলিয়া আপনার প্রশংসা করিতে পারিব না। সেই সামান্য নিন্দা,স ম'ন্য ক্ষতি আপনার মূর্ত্তিকে উড়াইয়া লইয়া আমার হৃদয়ে এমনই একটী কালো-দাগ বসাইবে যে, আমি বড় তপস্যায়ও তাহা মুছিতে পারিব না। হৃদয়ে বিন্দু মাত্র ভক্তি-রসের সঞ্চার হইলে কিছুতেই এই দাগ উৎ-পন্ন হয় না। যৌবন যেমন শরীরের একটী অবস্থা বিশেষ, ক্ষমাও সেইরূপ মানসিক একটী অবস্থা। পরচুলা পরিয়া যেমন যৌবন পাওয়া যায় না, বিচার বিবেচনা করিয়া সেইরূপ প্রকৃত ক্ষমা উৎপন্ন হয় না। পুত্র জন্মিলেই যেরূপ অপত্য স্নেহ আপনি উদিত হয়, ভক্তি জন্মিলে ক্ষমাও সেইরূপ আপনি উৎপন্ন হয়, ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকিয়া হাঁকিয়া তাহাকে আনা যায় না। কাহারও প্রীতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত থাকিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, সুতরাং ভক্তি আসিবে কিরূপে?

দ্বিতীয়, অব্যর্থকালত্বং অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট না করা ভক্তির একটী লক্ষণ। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি (ভক্ত) কাল ব্যর্থ যাইতে দেয় না। যাহাতে প্রভুর নাম নাই, সেবা নাই, এমন কার্য্য তিনি করিতে পারেন না। একটী শ্বাস প্রশ্বাসও ব্যর্থ যাইতে দেন না। কখন সৎসঙ্গ, কখন ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে, কখন প্রভুর সেবাতে রত থাকেন।

"না কহিবে গ্রাম্য কথা গ্রাম্য আলাপন।"

ভগবৎপ্রসঙ্গশূন্য সর্ব্বপ্রকারের আলো-চনাকে বৈষ্ণব সাধকগণ "গ্রাম্য কথা" ও "গ্রাম্য আলাপন" বলিয়াছেন।

তবে কি সংসারের অন্য কোন কাজ করিবে না? তাহা নহে, কাজ ত করিতেই হইবে, কেননা সর্ব্বাভিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে তোমার শক্তি কোথায়? কাজ ত করিবে, কিন্তু কি ভাবে করিবে?

বাড়ীতে নূতন জামাই আসিলে মেয়েরা যেমন নানা প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে মনে সর্ব্বদাই এই ভাবটী জাগরুক রাখে যে, জামাইকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সমস্ত কার্য্য করা হইতেছে, এইরূপ ভাবে সংসারের কার্য্য করিবে। গৃহিণী যেমন স্বামীর সংসার সাজায়, গোছায়, কিন্তু সর্ব্বদাই স্বামীকে মনে রাখে, সেইরূপ ভাবে সংসার করিবে। শুধু "সু-গৃহিণী" হইলে চলিবেনা, "পতিপ্রাণা" হওয়া চাই, নতুবা তোমার সমস্ত সংসারই মাটী হইল। আগে "প্রীতি" না হইলে কি "প্রিয় কার্য্য" হয়? সংসারটা স্বামীর বন্ধু, আগে স্বামীকে খুব ভালবেসে, তবে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মেলা মেশা উচিত, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, কেন না সংসারও সু-পুরুষ বটে, তাঁতে যদি মন মজে যায়, তবে ব্যভিচার হলো। ভক্তি অব্যভি-চারিণী, পতিব্রতা, সতী, তিনি অন্যের সঙ্গে ততটাই মিশিতে পারেন, যাতে স্বামীর অধি-কার অক্ষুণ্ণ থাকে।

তৃতীয় লক্ষণ, বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য।

ব্রহ্মলোকের ভোগের ইচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "তিনি (ভক্ত) সর্ব্বদাই এই ভাবিয়া থাকেন, আর সব অসার, আমার প্রভুই সার, তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। অনাসক্তির অর্থ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে বীতানুরাগতা।"

এই বৈরাগ্য শুষ্ক বৈরাগ্য নহে। সংসারের উপর চটিয়া গিয়া অথবা সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না বলিয়া আলগা দেওয়ার নাম বৈরাগ্য নহে। প্রকৃত বৈরাগ্য আর প্রেম একই কথা। মা যখন হাটের মধ্যে হারাণো ছেলে খুঁজে বেড়ান, তখন তিনি লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলেন, উচু নীচু খানা খন্দ কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, "কোথা গেলিরে আমার প্রাণের ধন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তিনি শুধু ছুটিয়া চলেন। সেইরূপ যখন ভগবানের প্রতি টান হয়, "কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কোথায় আমার সর্ব্বস্বধন" এই বলিয়া যখন প্রাণ অধীর হয়, তাঁহাকে না পাইয়া অন্য সমস্ত সুখের সামগ্রী যখন বিষের মতন বোধ হয়, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হইল। ভক্তির অঙ্কুর জন্মিলে এইরূপে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়।

৪র্থ লক্ষণ, মানশূন্যতা। "গুরুদেব বলিয়াছেন,—"যাঁহার সর্ব্বদাই অন্তরের দিকে দৃষ্টি থাকে, তিনি নিজকে ধূলা হইতে লঘু মনে করেন। যিনি সেরূপ নহেন, তিনিই নিজকে বড় ভাবিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অনন্তেতে সব ডোবা দেখে, সকলকে সে সুন্দর দেখে, তার অহঙ্কার আসিতে পারে না।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, তৃণ অপেক্ষা নীচু ও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করিয়া হরিনাম করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া একজন বলিয়াছিলেন

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ!
তৃণাদপি শ্লোক পড়ি ঘটিল বিষাদ।"

বস্তুতঃ ভক্তির প্রকৃতি জলের মতন। উচ্চ ডাঙ্গায় যেমন জল দাঁড়ায় না, ভক্তি সেইরূপ অতি মানীর হৃদয়ে তিষ্টিতে পারে না। একটী সঙ্গীতে আছে,

"গৌর প্রেমের বন্যাতে ডুব্‌লো সব ত্রিজগতে
সেজল রৈল বেধে নিম্ন হৃদে রৈলনা উচ্চ
ডাঙ্গাতে ইত্যাদি।

বলিতে গেলে অভিমানই ভক্তির প্রধান শত্রু। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার অভিমান থাকে না।

৫ম লক্ষণ, "আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা। "শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—"তাঁহার (ভক্তের) প্রাণে আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা বর্ত্তমান থাকে। "এই আমার প্রিয়তম, এই যে প্রভু আর ভয় নাই" এই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি নিজের জন্য প্রভুর কাছে কিছু বলেন না। "প্রভু খাইতে দাও, পরিতে দাও" এরূপ কিছু প্রার্থনা করেন না। বৃক্ষ যেমন ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতির অত্যাচার সহ্য করিয়া স্থির থাকে, তেমনই তিনিও দুঃখ বিপদে অটল হইয়া থাকেন। তাঁহার আনন্দের পরিসীমা নাই, অথচ তাঁহার প্রাণে ইষ্টদেবের জন্য লোভ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।"

পূর্ণ আশা অথচ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা, ইহাই আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা। কি চমৎকার কথা। তিনি আমার, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইব, এই বিশ্বাস ও আশা না থাকিলে কি লইয়া জীবন ধারণ করিব? কিন্তু এই আশার উপর নির্ভর করিয়া ভক্ত কি বসিয়া কাল কাটাইতে পারেন? প্রাণনাথের মিলা-

নের জন্য প্রতি পলে পলে তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। শ্রীকবীর সাহেব বলিয়াছেন, 'হে প্রিয়তম, তোমার বিরহ কাল-সর্পের আকার ধারণ করিয়া আমার কলিজায় ঘা করিয়াছে, তথাপি আমি পাশ ফিরিব না, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়া খাও,"

ভক্ত কি করিয়া পাশ ফিরিবেন? পাশ ফিরিলে যে প্রিয়তমকে হারাইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, তাই পূর্ণ আশায় আশ্বস্ত হইয়া শ্রীমতী বাসর শয্যা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, সে অপেক্ষার মধ্যে পলে পলে উৎকণ্ঠা। ভক্ত কবি জয়দেব গোস্বামী এই "আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার" কথা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং"

পাখীটী নড়িতেছে, পাতাটী পড়িতেছে, অমনি শ্রীমতী প্রিয়তম আসিতেছেন ভাবিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন, সচকিত নয়নে পথ-পানে তাকাইতেছে, ভক্তের যদি ভগবানের জন্য এইরূপ অবস্থা হয়, তবে তাহাকেই বলে "আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা।" ভক্তির অঙ্কুর মাত্র জন্মিলে সাধকের প্রাণে এইরূপ অবস্থা জন্মে।

ষষ্ঠ লক্ষণ, "নাম গানে সদারুচিঃ"। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "তিনি (ভক্ত) যে নাম করেন, করিতে হইবে বলিয়া করা নয়, রুচির সঙ্গে করেন। সে রুচি সর্ব্বদাই শ্বাস প্রশ্বাসের মতন লাগিয়া আছে। সুর মিলিল কি না, তাল ঠিক হইল কি না, এ সকলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই, কেবল নামই তাহার লক্ষ্য। পথের মুটে মজুর যদি নাম করে, তাহা শুনিয়া "ও কে নাম কল্লেরে" বলিয়া তিনি মোহিত হইয়া যান।"

"নাম গানে সদারুচিঃ" এখানে "সদা" শব্দটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। সাধক মাত্রই জানেন যে "নাম" ও "নামী" একই বস্তু, নামী ভিন্ন নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, স্বতন্ত্র মূর্ত্তি নাই। ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"নামচিন্তামণিকৃষ্ণঃ চৈতন্যরস বিগ্রহঃ
নিত্য শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনঃ।"

নামই চিন্তামণি কৃষ্ণস্বরূপ, নামই বিগ্রহ। কিরূপ বিগ্রহ? রসবিগ্রহ। কিরূপ রসবিগ্রহ? চৈতন্য-রস-বিগ্রহ অর্থাৎ নাম চৈতন্যস্বরূপ, রসস্বরূপ ও বিগ্রহ স্বরূপ। নাম নিত্য শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, কেননা নাম ও নামীতে কিছুই প্রভেদ নাই।

তুমি যে নাম জপ কর, সেই নামের মধ্যে তোমার পূর্ণাঙ্গ সাধনা জমাট বাঁধিয়া আছে। তুমি ঈশ্বর বলিতে যাহা কিছু বুঝ, সমস্তই তুমি ঐ নামে অর্পণ করিয়াছ। তোমার উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, সমস্তই ঐ নামে নিহিত আছে। নামের শব্দার্থের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই, কেননা তুমি তোমার সর্ব্বস্ব দিয়া সেই নামকে সাজাইয়াছ, অভিধান খুঁজিয়া সে অর্থ কোথায় পাইবে? "পিতা" শব্দের অর্থ পালনকর্ত্তা, কিন্তু তুমি পিতা বলিতে কি শুধু পালন-কর্ত্তাই বুঝিয়া থাক? তোমার সাধনের নাম যদি ব্যাকরণের হিসাবে অর্থশূন্য হয়, তাহাতে তোমার বিন্দু-মাত্রও ক্ষতি নাই।

সাধন বলে নাম "সজীব" হয়, তখন উহাকে সিদ্ধ-মন্ত্র বলে। তখন উহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে আকুল করে," ইহার পরে উহা "রসময়" হয়। তখন সাধক

বলেন, "যপিতে যপিতে নাম অবশ করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

ইহার পরে নাম যখন "বিগ্রহ" রূপে অঙ্গ স্পর্শ করে, তখন প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি কৃতার্থ হইয়া সেই বিগ্রহের সেবায় সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিসর্জ্জন করে। শ্বাস প্রশ্বাস যেমন প্রাণ রাজ্যের রাজা, সমস্ত দেহ-যন্ত্র যেমন উহারই অপেক্ষা করে, সেইরূপ "চৈতন্য রসবিগ্রহ নাম" মনোরাজ্যের রাজা হয়, উহা শ্বাস প্রশ্বাসের মতন অবিরত প্রবাহিত হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি ও বাসনা কামনা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে তাহাকেই পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়। এই অবস্থায়ই "নামগানে সদারুচি" উৎপন্ন হয় এবং ইহাই ভক্তি সঞ্চারের একটী লক্ষণ।*

৭ম লক্ষণ,---আশক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে। এখানে "আশক্তি" শব্দটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধনের প্রতি কৃপণ ব্যক্তির যেরূপ প্রাণের টান, প্রণয়মুগ্ধ ব্যক্তির প্রণয়িনীর প্রতি যেরূপ অনুরাগ, তাহারই নাম আশক্তি। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবানের গুণ শ্রবণকীর্ত্তনে তাঁহার সেইরূপ আশক্তি জন্মিয়া থাকে। প্রিয়তমের কথা বলিয়া শুনিয়া কি সাধ মেটে? তাঁর কথা, তাঁর প্রসঙ্গ "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।"

৮ম লক্ষণ,—"প্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে।" ভগবানের বসতি স্থলে ভক্তের প্রীতি জন্মিবে। ভগবানের বসতি স্থান কোথায়? তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সুতরাং সমস্ত জগৎকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে হইবে। মানুষ কি চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া এইরূপ প্রীতি অর্পণ বা অর্জ্জন করিতে পারে? তাহা কখনই সম্ভব নহে, তবে সূর্য্য উদিত হইলে যেমন সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, সেইরূপ, ভগবানে প্রীতি হইলে সমস্ত বস্তুতে প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রদীপ হাতে লইয়া তুমি কয়টী বস্তু দেখিবে? একটী দেখিতে গেলে অন্যটী আঁধারে পড়িবে। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমগ্র বৃক্ষটীতে উহা সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ, হরিকে প্রেম করিলে সে প্রেম সমস্ত সৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়, ভক্তগণ ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। তখন আর বিচার বিবেচনা করিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে হয় না; প্রেম আপনি আসিয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—"যখন ভগবানের দিকে টান হয়, তখন, "সকল বস্তুই তাঁহার" এই বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের উপর প্রাণের টান উপস্থিত হয়। তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থকে যেরূপ ভালবাসা যায়, আগে কি তেমন ধারা হয়? আমার প্রিয়তমের বস্তু বলিয়া যে ভালবাসা, তাহার কি তুলনা আছে? কেহ যদি প্রণয়ীর পত্র পায়, সে তাহাকে কত চুম্বন করে, কত আদর করিয়া সোণার কৌটায় রাখিয়া দেয়, উহাকে ইষ্টকবচ করিয়া রাখিলেও যথেষ্ট আদর হইল

* কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক "নলদময়ন্তী"ও "হাসন হোসেন" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, সুরের সহিত যিনি উহা শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, যথা,—

"কৃষ্ণ ইতি আখর দুটী　　পুলক বর পরশে হৃদি
বদনে বর বিলসতি,　　প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি
বাঢ়য় রতি রসনা কোটী লাগি। শুরুগহ মানি বহুভাগী।
(সখি একমুখে আর সাধ মিটে না)

না বলিয়া মনে করে। এই যে বৃক্ষপত্র, এই যে চন্দ্রতারা, এ সকল তাঁহার হাতের অক্ষর, ইহা বুঝিলে ইহাদের আমি কোথায় রাখিয়া দিব? না, আমি "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" রাখিয়া দিব।"

যাহারা অবতার-বাদী, তাহাদের অবতীর্ণ ভগবান্ যেখানে যেখানে মর্ত্যলীলা করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ প্রীতি জন্মে, তাই অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, এবং নবদ্বীপ ও নীলাচল দেখিবার জন্য ভক্তের এত আকিঞ্চন। ভক্ত কি ভাবে ব্রজের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করেন, অবতারবাদী ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। ভক্ত খ্রীষ্টান জেরুজিলাম বলিতে যাহা বুঝেন, তাহা অপার্থিব বস্তু। বৌদ্ধগণ বুদ্ধগয়াকে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখেন, অন্যে সেরূপ দেখিতে পারেন না।

ভক্তের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, যুক্তির দ্বারা বুঝা যায় না। তোমার প্রণয়িনীর ফটোখানা যে তোমার প্রণয়িনী নহে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান, তবে উহাকে পুষ্পচন্দনে সাজাইয়া তৃপ্তিলাভ কর কেন? উহা বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রাণ জুড়াইতে চাও কেন? শুষ্ক-হৃদয় তার্কিক বলিবে, "ইহা একান্তই কুসংস্কার," আর সে কথা শুনিয়া প্রেমিক বলিবে, "তুমি আমার নিকট হ'তে দূর হও।"

মোট্‌ কথা, ভক্তির অঙ্কুর হইলে আর পাপ থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "যদি আমি পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, নাচি, কুঁদি, কিন্তু পরস্ত্রীকে কু-ভাবে দর্শন করি, মিথ্যা বলি, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া বেড়াই, তবে আমি এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, আমার ভালবাসা পাপে। একটু প্রেম হইলে কি আর পাপ থাকে?" অন্যত্র "যেমন জলে হাত দিয়ে, আগুনে হাত দিয়ে (উহার অস্তিত্ব) প্রতীত হয়, পরমেশ্বর আছেন, এটী যতদিন তেমনি ধারায় প্রতীত না নয়, ততদিন প্রেম হয় না।" আমি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পাপ যায় কিসে? প্রত্যুত্তরে তিনি সুর করিয়া গাহিলেন, "প্রেমমুখ দেখবে তাঁহার।"

কোন একটী জিনিসের, বস্তার গায়ে "উত্তম জিনিস" মার্কা মারিলেই উহার ভিতরকার জিনিস প্রকৃত পক্ষে উত্তম হয় না, সেইরূপ, কতকগুলি তত্ত্ব-কথা মুখস্থ করিয়া "ভক্ত" কি "জ্ঞানী" উপাধিধারণ করিলেই কেহ কখন ভক্ত বা জ্ঞানী হয় না। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই জন্য বড়ই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ দিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে, তিনি মনগড়া কথা লেখেন নাই, হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভগবান্ আমাদের দেশকে এই বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, আমরা যেন ঋষি-প্রবর্ত্তিত আদর্শকে খর্ব্ব না করি এবং নিজে উচ্চে উঠিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিতে না পারিয়া, ধর্ম্মকে নীচে নামাইয়া আপনার সঙ্গে মিলাইয়া তৃপ্তিলাভ না করি।

আমরা যতই হীন হই না কেন, আমাদের আদর্শ যেন উচ্চ থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

রাজা বিক্রমাদিত্য। (২)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়াছি, গুপ্ত-সম্রাট্ নরসিংহ,--মালব-রাজ যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্ম্মার সহায়তায় হুনদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করেন। ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এই বিজয়-লাভের পর, যশোধর্ম্মন্ দুইটী প্রকাণ্ড শিলাস্তম্ভে এই গৌরব-কাহিনী নিজের নামে খোদাইয়া প্রোথিত করিয়া দেন। তাহাতে ইনি আপনাকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তিনিই ভারত-সম্রাট্ বলিয়া, আপনার গুণগাথা লিখিয়া রাখেন। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই ঘটনা দ্বারা ইঁহাকেই, বিক্রমাব্দের বর্ত্তমান ভাবে নূতন-প্রবর্ত্তনাকারী ও কবিগণের আশ্রয়-দাতা বিক্রমাদিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কালিদাস-প্রমুখ নবরত্নের যে কাহিনী জনমুখে প্রচলিত আছে, এই যশোধর্ম্মের সভাতেই সেই নবরত্ন আপন প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল। ইহাই তাঁহাদের অনুমান।

পণ্ডিত Furgusson এই বিক্রমাব্দ সম্বন্ধে একটী চমৎকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, চিরকালই এ দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে একটা বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আপন পরাক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এই পুনরুত্থান-ব্যাপারের একটা স্মৃতি রক্ষা করা আবশ্যক বোধে, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণজাতি একটা অব্দের সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। ৫৩০ অব্দে এই হুন-বিতাড়ন সংঘটিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ ইহাই একটা প্রকাণ্ড সুযোগ মনে করিলেন এবং এই ৫৩০ অব্দটীকে প্রাচীনতার মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে, ইঁহারা কয়েক শত বৎসর পশ্চাৎদিকে সরাইয়া দিয়া, ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ইহা বিক্রমরাজ-প্রবর্ত্তিত অব্দ এবং ইহা পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ ৫৭ বৎসরে রাজা বিক্রম কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, উহাই এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়ের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, ভারতে কোন কালেই বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ ছিল না। আচার্য্যগণ, পাশাপাশি বসিয়া একত্র উভয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কত সম্মানের সহিত হিন্দুদ্বারা আদৃত হইতেন। অপিচ, ব্রাহ্মণগণ এতবড় একটা প্রতারণার আশ্রয় লইয়া, পরবর্ত্তী অব্দটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং লোকে তাহাই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিবে, ইহা অনুমান করিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। পরন্তু, গিয়াবিসপুর শিলালিপি ও অন্য শিলালিপি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, অনেক পূর্ব্ব হইতেই মালব-রাজ-প্রবর্ত্তিত অব্দ মধ্যভারতে প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ রাজা বিক্রমাদিত্য "শকারি" নামে বিখ্যাত। কিন্তু এই যুদ্ধে হুনজাতি বিতাড়িত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে ভারতের লোক, শক ও হুন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক, ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

যশোধর্ম্মন্ বিষ্ণুবর্দ্ধন এই হূনজয় ব্যাপারের গৌরব যে নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। তখনও গুপ্তসম্রাট্ নরসিংহ বালাদিত্য প্রতাপশালী ছিলেন। এই সমরে তিনিই প্রধান নায়ক ছিলেন। যশোধর্ম্মা নিজে যাহাই লিখিয়া যাউন, তিনি গুপ্তরাজের একজন অধীন প্রাদেশিক রাজা ভিন্ন অন্য কিছু ছিলেন না। আর একটী কথাও বিবেচনার যোগ্য। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে ভারত-ভ্রমণে আইসেন। তিনি এই যুদ্ধের গৌরব বালাদিত্যকেই দিয়া গিয়াছেন; যশোধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। তৎকালে ভারতে, এই যুদ্ধের জন্য কেহই যশোধর্ম্মকে গৌরবভাজন বলিয়া মনে করিতেন না। এই সকল কারণে যশোধর্ম্মকেই বিক্রমাদিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

আমরা এই উপলক্ষে আর একটী ঐতিহাসিক সত্যের দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়টী কেন ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই, ইহা বুঝা যায় না।

ঐতিহাসিক আল্‌বিরুনী একটী শকযুদ্ধের বিবরণ ও বিক্রমাব্দের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা করুর বা মুলতানের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের তারিখ ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। বিক্রমাদিত্য, এই যুদ্ধে মুলতান নগরে শকদিগকে পরাজয় করেন। শকনৃপতি বড় নিষ্ঠুর ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। এই জন্য এই বিজয় ঘটনা ভারতে বড় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যও এই ঘটনায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু ইনি কোন্ বিক্রমাদিত্য?

হুয়েনসাং যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তখন তিনি বর্ত্তমান বরোদা রাজ্যের নিকটবর্ত্তী কোন এক রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই রাজ্যের অধিবাসীবর্গ অত্যন্ত বিদ্বান্ বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। অসংখ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে ও হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত, এই রাজ্য অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তৎকালে এ রাজ্যের একজন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ অত্যন্ত বিদ্বান্ ছিলেন এবং বিদ্বদ্ ব্যক্তিবর্গের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। হুয়েনসাং বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রমণ-কালের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে শিলাদিত্য নামে একজন বিদ্বান্ রাজা জীবিত ছিলেন। হুয়েনসাং-এর এই উক্তি হইতে, উক্তরাজ্যের রাজা শিলাদিত্য ৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, ইহাই পাওয়া যায়। হুয়েনসাং আরো বলিয়াছেন যে, এই শিলাদিত্যের পিতার নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। ক্ষিতিস্তা-গ্রন্থে এই শিলাদিত্যকে ভোজ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং ইনি ৫৩০ – ৫৮০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ৫৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য জীবিত ছিলেন, পাওয়া যাইতেছে। শ্রাবস্তিতেও ইঁহার এক রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বসুবন্ধু ও অসঙ্গ, এই বিক্রমাদিত্য ও শিলাদিত্য উভয়ের সময়েই বাস করিতেন বলিয়া হুয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-ইতিহাসও এ সকল কথার সাক্ষ্য দিতেছে। বার্সিলজুব (Wassiljew) বৌদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয় যে, গম্ভীর পক্ষের পুত্র শ্রীহর্ষ, বৌদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গের সম্মান করিতেন এবং শীলাদিত্য এই শ্রীহর্ষের পুত্র। তাহা হইলেই আমরা দেখিতেছি যে, শিলা-

দিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের অপর নাম শ্রীহর্ষ ছিল। এই শ্রীহর্ষ-বিক্রমাদিত্য ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গত হন, ইহাও পাওয়া যাইতেছে।

আল্‌বুরিণী যে শকযুদ্ধের বিবরণ দিয়াছেন, সেই যুদ্ধ যে এই হর্ষ বিক্রমাদিত্য করেন নাই, ইহার প্রমাণ কৈ? আমাদের বোধ হয়, এই ভোজের পিতা হর্ষবিক্রমই কোন শক-নৃপতিকে তৎকালে তাড়াইয়া দিয়া ভারতে বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কাশ্মীর ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণী প্রণেতা কল্‌হনের কথা হইতেও ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। কল্‌হন বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরাধিপতি হিরণ্যের মৃত্যুর পর, কাশ্মীর সিংহাসনে নৃপতির অভাব হওয়ায়, উজ্জয়িনী-রাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের নিকটে দূত প্রেরিত হয়। তিনি মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসাইয়া দেন। ইহা ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। আমাদের বোধ হয়, এই উজ্জয়িনীরাজ পূর্ব্বোক্ত শিলাদিত্যের পিতা হর্ষ বিক্রমাদিত্য।

বরোদার নিকটস্থ এই রাজ্যের নাম মো-লা-পো বলিয়া হুয়েন্‌সাং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেকে ভুল করিয়া এই মো-লা-পোকে মালব রাজ্য বা উজ্জয়িনী বলিয়া ধরিয়া লইয়া, এই শিলাদিত্যকে, কনোজের শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তাহা Vincent Smith উত্তম রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই মাতৃগুপ্তকেই কালিদাস বলিয়া মনে করেন। যদি তাহাই হয়, তবে কালিদাস এই শকারি বিক্রমের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বলিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি ৫৩০ ও ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা বলিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। আমরা প্রথম প্রস্তাবে যে গুপ্ত সম্রাটের অন্যতম সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছি, কালিদাস তাঁহারই সভাকবি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। একথা কেন বলিতেছি, তাহা আগামী বারে বলিব। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বর্ণ-তত্ত্ব। (৫)

এই আল্পস্‌ পার্ব্বতীয়গণ ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই বসবাস করিতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাংগারী, রুসিয়া ইত্যাদি সর্ব্ব দেশেই ইহারা বাস করে। কিন্তু কেবল ইহারাই যে ঐ সকল দেশে বাস করে, তাহা নহে; অন্য জাতীয়গণও বাস করে। যাহা হউক, ইহারা সকলেই কুণ্ডলকেশ-শ্রেণীভুক্ত। কুঞ্চিত ও কুণ্ডলকেশগণ মধ্যে অতি অসভ্য হইতে অতি সভ্য জাতিও দেখা যায়। কুণ্ডলকেশগণ মধ্যেও তাহাই। একদিকে যেমন মাউরি, ফিজিয়ান্‌ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ নরমাংস ভুক্ত জাতি, অন্যদিকে, তেমনই ফর্সা বর্ণের সুসভ্য ইউরোপীয় কতক কতক জাতিও এতদুভয় শাখাতেই দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে সরল কেশগণের কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

সরল-কেশ-শাখা। এই শাখাস্থ মানব-

গণের উল্লেখ করিতে প্রথমেই ইউরাল-আল্‌টাই-বাসিগণের উল্লেখ কবিব। ইহারা কালমুখ, তুর্কী ও উগ্রিয়ান্‌, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা এসিয়া খণ্ডের উত্তর ও মধ্যভাগে প্রধানতঃ বসতি করে। আমেরিকার এবং ইউরোপেরও সর্ব্বোত্তর ভাগে এই শাখাস্থ উগ্রিয়ান্‌, শ্রেণীর ল্যাপ ও ফিন্‌গণ নিবাস করে। ইহারা চির তুষারাবৃত দেশ হইতে উষ্ণদেশ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই আছে। মঙ্গলগণ এই শাখার সহিত নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত। সম্ভবতঃ ইউরাল্‌-আন্টাই-গণ প্রথমে মধ্য এসিয়াতেই বাস করিত। কিন্তু ঐ স্থান জলশূন্য শুষ্ক বালিতে পরিণত হইলে ইহারা উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ শিকারী, কৃষিকার্য্য প্রায় করে না। ইহারা ভারতবর্ষেও প্রবেশ করিয়া জাতীয় চিহ্ন রাখিয়াছে। ইহাদিগের গৃহপালিত পশু মধ্যে বহু শৃঙ্গযুক্ত হরিণ (Reindeer), অশ্ব, কুকুর উল্লেখ-যোগ্য। পরিচ্ছদ এই শ্রেণীতে পশু চর্ম্ম হইতে বস্ত্র পর্য্যন্ত নানা প্রকারই আছে। ভূমি একমালি, ইহাদিগের সমাজ পরিবার-প্রধান, জাতীয় ভাব প্রায় নাই। তবে ইহারা দল গঠন করিয়াছে। কতিপয় পরিবার মিলিত হইয়া দল হয়। তন্মধ্যে বৃদ্ধগণের হস্তেই প্রভুত্ব। তাহা হইলেও মানুষে মানুষে আমাদিগের ন্যায় প্রভেদ নাই। সকল মানুষই সমান। ইহাদিগের পিতৃভক্তি অসাধারণ, মন্ত্র তন্ত্রই ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্মাচরণ, ইহারা কেহ কেহ বৌদ্ধ, কিন্তু এই শাখাস্থ তুর্কী শ্রেণী মুসলমান।

মঙ্গলগণ। সরল-কেশ শাখায় মঙ্গলগণ সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য। ইহাদিগের বিস্তৃতি মধ্য এসিয়া হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত। তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয়দ্বীপ, যব দ্বীপ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ইহারা বিদ্যমান। ইউরাল্‌ আন্টাই শ্রেণী এবং এই শ্রেণীতে ইউরোপ এবং এসিয়ার অধিকাংশ স্থানই পূর্ণ। মঙ্গল নাম প্রথমে তুর্কী, ও খাস্‌ তুঙ্গুল প্রভৃতি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী স্থায়ী আবাসহীন ভ্রমণকারীদিগকে দেওয়া হইত, কিন্তু এক্ষণে এই নাম প্রধানতঃ পীতবর্ণ জাতিদিগকে দেওয়া হয়। এই শাখায় জাপানীগণ যেমন উন্নত হইতেছে, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতির অধিবাসীগণ তেমনই (জাতি হিসাবে) অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু জাপানেও যাহারা অমিশ্র মঙ্গোলীয়, তাহাদিগের উন্নতি নাই। পূর্ব্বোক্ত-দ্রাবিড়ীয়গণের ন্যায় খাটী মঙ্গলীয়গণও দেহ বিধানে এবং ক্ষমতা বিধানে অবনত হইতেছে। দ্রাবিড়ীয়গণ নানাবিধ ভূমি ও জলবায়ু উপভোগ করে, মঙ্গোলীয়গণও তাহাই করে; মরুদেশ, সমুদ্র, শীত প্রধান দেশ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, পর্ব্বত, জঙ্গল কিছুই যেন ধাতুগত অবনতি নিবৃত্ত করিতেছে না। কিন্তু ইহাদিগের বংশানুক্রম এত প্রবল যে, ইহারা (দ্রাবিড়ীয়গণের ন্যায়) অন্য কোন শাখায় কিম্বা শ্রেণীর মানবের সহিত সংগত হইয়া অপত্যোৎপাদন করিলে তাহার আকৃতি প্রায় মঙ্গোলীয় ছাঁচের হইয়া থাকে। ইহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। তিব্বতীয়, চীনা, জাপানী প্রভৃতির সাহস, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক আচার ব্যবহার—সকলই আমাদিগের সুপরিজ্ঞাত। সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা হিন্দুগণের ন্যায় এবং ইহাদিগের মধ্যে চীনাগণ এক্ষণে রাজ্যশাসনে সাধারণ তন্ত্র অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা পীতবর্ণ।

এস্কুইমকস্ জাতি। ইহারা পীত ও কটাবর্ণ; দীর্ঘকরোটী। ইহারা উত্তর আমেরিকার তুষারাবৃত উত্তর প্রদেশে বাস করে। ইহারা স্বাধীনতাপ্রিয় এবং সহর্ষ। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। ইহারা শিকারী। ইহারা শীতকালে বরফের গৃহে বাস করে, এবং গ্রীষ্মকালে চর্ম্ম-নির্ম্মিত গৃহে থাকে। এত শীতে থাকিয়াও এই জাতি ফর্সা হয় না। কোন কোন সম্প্রদায় কটা, এমন কি, কালও আছে। ইহারা আকৃতিতে মঙ্গোলীয়। ইহারা এক বিবাহ করে, কিন্তু কখনও স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মধ্যে একদা বহু বিবাহ দেখা যায়, তখন স্ত্রীগণ একদা বহু-স্বামীক, এবং পুরুষগণ বহু-পত্নীক। ইহারা পরিবারে পরিবারে বিভক্ত, দল গঠন করে নাই বলিলেও হয়। পরিচ্ছদ, শিকারের অস্ত্র এবং শিলাইর দ্রব্য ব্যতীত সকল সম্পত্তিই একমালী। ঐসকল নিজস্ব সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইয়া থাকে। কিন্তু ভাল অস্ত্রখানি কনিষ্ঠ পুত্র পায়। মানুষের ভূত প্রেত এবং পশুদিগেরও ভূত প্রেত, ইহাদিগের আরাধ্য। তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করে।

পেটাগণীয়গণ। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশে বাস করে। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; ইহারা স্থানে স্থানে শিকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অশ্ব ইহাদিগের গৃহপালিত পশু। এই জাতি ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে এক্ষণে সঙ্করবর্ণ অনেক জাত হইয়াছে। ইহারা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কিন্তু প্রায় সকলেই বর্ণসঙ্কর। ইহারা দীর্ঘকায়। বর্ণ তামাটে, বরং একটু কাল; চক্ষু ঈষৎ বক্র ভাবে স্থিত, কৃষ্ণবর্ণ কেশ। ইহারা বন্য মাংস শিকার করিয়া খায়। ঘোড়ার মাংসও কেহ কেহ খাইয়া থাকে। ইহারা উদ্ভিদও আহার করে, কিন্তু কৃষি কার্য্য করে না। প্রাপ্তবয়স্কগণ বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা রৌপ্য অলঙ্কার ব্যবহার করে। চামড়ার তাম্বু ইহাদিগের গৃহ, কেহ বা মল দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। ইহাদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীন, কিন্তু পুরুষানুক্রমিক দলপতিকে মান্য করিয়া চলে। তাহা হইলেও দলপতির ক্ষমতা অধিক নহে। ইহারা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে, এবং ইহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভূত প্রেতের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহারা মৃতকে বসিয়া থাকা অবস্থায় গোর দেয়, তাহার সহিত তাহার অস্ত্রাদিও পুঁতিয়া ফেলে।

ইহাদিগের এক সম্প্রদায় (= ফিউজিয়ান) খর্ব্বকায়, কিন্তু তাহাদিগের মাথা বড়, নাসিকা নীচু, নাসারন্ধ্র প্রশস্ত, ওষ্ঠ পুরু, চক্ষু কাল ও চক্রভাবে স্থিত। ইহারা মাংস এবং সম্বুক আহার করে, কিন্তু ফলমূল খায়। পূর্ব্বে ইহারা বৃদ্ধ নারীদিগের মাংস আহার করিত বলিয়া শুনা যায়। ইহাদিগের পাকের কোন প্রকার বাসন নাই; মৃতভাণ্ডও প্রস্তুত করিতে জানে না। পৃষ্ঠে পুরুষগণ একখণ্ড চর্ম্ম ব্যবহার করে, অন্য পরিচ্ছদ নাই, স্ত্রীগণ লজ্জাস্থান মাত্র আবরণ করে। কিন্তু বোধ হয় সে অলঙ্কার স্বরূপ, লজ্জা নিবারণ জন্য নহে। গাছের ডাল অথবা খুটি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। পুরুষগণ মৃগয়া করে, স্ত্রীগণ মৎস্য ধরে। ইহারা এক বিবাহ-পরায়ণ। ইহারা সাহসী, অভিমানী, কিন্তু নিষ্ঠুর। ইহাদিগের মধ্যে অসতীর জন্য

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য আদিম অধিবাসীও প্রায় এইরূপ। কিন্তু উত্তর আমেরিকার লোহিতবর্ণ মনুষ্য এখন আর নাই বলিলেই হয়। খ্রীষ্টীয় সভ্যতা তাহাদিগের প্রায় বিনাশ সাধন করিয়াছে।

শ্রীশশধর রায়।

সিদ্ধকাঠীর সালিসী।

প্রথম পক্ষ।

শ্রীকুলদাচরণ রায়চৌধুরী
পিতা মৃত চিন্তাহরণ রায়চৌধুরী
সাকিন সিদ্ধকাঠী, ষ্টেসন নলছিটী,
জাতি বৈদ্য, পেশা জমীদারী।

দ্বিতীয় পক্ষ।

১। শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
২। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
পিতা মৃত মথুরানাথ রায়চৌধুরী
৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
পিতা মৃত তারাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
সাকিন সিদ্ধকাঠী, ষ্টেসন নলছিটী,
পেশা জমীদারী।

আমি ২০শে জানুয়ারী, ১৯১৩, সিদ্ধকাঠীর শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায়চৌধুরী মহাশয়দের স্বাক্ষরিত এক পত্র পাই। তাহাতে আমাকে সালিস মান্য করার কথা ছিল। তদুত্তরে আমি বিষয় অবগত হওয়ার জন্য পত্র লিখি। তাহার উত্তর পাইলে লিখি যে, যথারীতি অচল-নামা এডিসনাল-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের নিকট হইতে পাইলে আমি বরিশাল যাইয়া সালিসী করিব এবং পরে কলিকাতা পৌঁছিয়া আমার "রায়" দিব। তৎপর ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩, বরিশালের এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের ১০ই ফেব্রুয়ারির পত্র পাই। তাহার সহিত দুই পক্ষের দুইখানি অচলনামা ছিল। তিনি ১৭ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে আমার "মন্তব্য" প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাকে মকদ্দমা স্থগিত রাখিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি টেলিগ্রাম এবং পাথেয় পাঠাইতে ঐ তারিখে কুলদাবাবুকে টেলিগ্রাম করি। কুলদাবাবু ১৬ই ফেব্রুয়ারি টেলি-মনি-অর্ডারে ১৪৲ প্রেরণ করেন। আমি ঐ তারিখেই বরিশাল রওয়ানা হইয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল পৌঁছি। ঐদিন অপরাহ্ন হইতেই কার্য্যারম্ভ করি। শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দুইখানি অচল-নামা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা যথারীতি সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া আমি উভয় পক্ষকে যথারীতি অচল-নামা সম্পাদন করিয়া দিতে অনুরোধ করি। ১৭ই ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ১০৭ ধারার মকদ্দমা স্থগিত করেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য্য করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া, যথারীতি ॥০ আনা ষ্টাম্পে এক অচলনামা সম্পাদন করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করেন। তাহাতে লিখিত ছিল "আমাদের পক্ষদ্বয় মধ্যে বিদেশ-প্রত্যাগতের-সংস্পর্শ-জনিত সামাজিক তর্ক উপস্থিত হইয়া তদুপলক্ষে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা বরিশাল ফৌজদারী কোর্টে দায়ের আছে, ও যে সকল বিবাদ উপস্থিত আছে, তৎ সমস্ত আপোসে মীমাংসা

করতঃ জনসাধারণ ও পক্ষদ্বয় মধ্যে শান্তি সংস্থাপনের জন্য আমরা উভয়পক্ষ আপনাকে সালিস মান্য করতঃ এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, উভয় পক্ষের তর্কিত বিষয় আপনি পক্ষদ্বয়ের আপত্তির বিষয় লিখিত দাবির ফর্দ্দ গ্রহণে হিন্দুধর্ম্ম বলবৎ রাখিবা, আবশ্যকীয় প্রমাণাদি গ্রহণে পক্ষদ্বয়ের ফর্দ্দের লিখিত প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে যে রোয়দাদ দিবেন, তাহা আদালতে প্রবল গণ্য হইবে ও উভয় পক্ষ তাহাতে বাধ্য থাকিব এবং তদনুসারে উপস্থিত মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইবে। এতদর্থে আপন আপন সম্মতি ক্রমে সরল ভাবে এই অচল-নামা লিখিয়া দিলাম।"

এই অচল-নামা প্রাপ্তির পর আমি যথারীতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং উভয় পক্ষের লিখিত "দাবির" ফর্দ্দ চাই। ২০শে ফেব্রুয়ারি লিখিত দাবির ফর্দ্দ গ্রহণের জন্য নির্দ্ধারিত করি। কোন পক্ষই লিখিত দাবির ফর্দ্দ অর্পণ করেন না, বলেন যে, অচল-নামার লিখিত দাবির মীমাংসা হইলেই হইবে। তৎপর অনেক আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই মকদ্দমা স্থগিত রাখিতে সম্মত হন, ইহার পর প্রমাণাদি উপস্থিত করার জন্য উভয় পক্ষকে অনুরোধ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি অধিবেশন হয় নাই। ২২শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বিশেষ অধিবেশন হয়। এই দিন অনেক প্রমাণাদি গৃহীত হয়। সিদ্ধকাঠীর সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের ১৫০ পৃষ্ঠার উপর অধিক নির্ভর করেন। বিদেশ-গমন-সংস্পর্শ-জনিত পাপে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার প্রামাণ্য তিনি দেখাইতে পারেন নাই। বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি বলেন যে, আর প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণ ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত দেবশর্ম্মণ মহাশয়গণের যে পাতি দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত করেন, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের উল্লিখিত একটী মনু বচন উল্লিখিত হয়। কিন্তু যিনি জাপান বা বিদেশ গমন করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে, তাহার সংস্পর্শে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ পতিত হইবে কি না, এ সম্বন্ধে কোন বচন উদ্ধৃত হয় নাই। সংস্পর্শ-জনিত-দোষ জানার জন্য আরো চেষ্টা করা হয়। তাহাতে জানা যায়, ঐরূপ স্পর্শ-দোষে উভয় পক্ষই দুষ্ট। সে সকলের উল্লেখ, নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায়চৌধুরী উভয় পক্ষের গুরুমহাশয়ের যে পত্র অর্পণ করেন, তাহা নথীভুক্ত করা হয়। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন, কেহ উপবাস করিবেন, কেহ জপ করিবেন, কেহ গঙ্গাস্নান করিবেন ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হন, কিন্তু তিনি কাণে কম শুনেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। তবে তিনি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অনেক কথা বলেন।

অনেক আলোচনার পর উভয় পক্ষ এক এগ্রিমেণ্ট দাখিল করিতে প্রতিশ্রুত হন।

ঐ এগ্রিমেণ্টপত্র ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রাতে যথারীতি লিখিত হয়। প্রথম পক্ষ সময় চাওয়ায় অপরাহ্নে স্বাক্ষর হইবে ধার্য্য হয়। অপরাহ্নে ষ্ট্যাম্প শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায়চৌধুরী সঙ্গে করিয়া আনেন। অপরাহ্নে এগ্রিমেণ্ট ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইলে, উকীল শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র তালুকদার, শ্রীযুক্ত রতিকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী প্রভৃতি ব্যক্তির ও আমার সমক্ষে সানন্দে স্বাক্ষরিত হয় ও উভয় পক্ষ কোলাকুলি ও প্রণামাদি করেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি এই এগ্রিমেণ্টের কথা শ্রীযুক্ত এডিসনাল-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়কে আমি জানাই। এগ্রিমেণ্টে এক ব্যক্তির স্বাক্ষর বাকী ছিল বলিয়া তাহা ঐ দিন অর্পণ করি নাই। উহাতে স্বাক্ষর করাইতে আমি সিদ্ধকাঠী যাই। এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় আমার সমক্ষে উহাতে স্বাক্ষর করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ঐ দলিল আমি শ্রীযুক্ত এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়া কলিকাতায় রওয়ানা হই।•

শাস্ত্রীয় প্রমাণ, উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক, আলোচনা ও প্রমাণ এবং স্বীকৃতি অনুসারে আমার সিদ্ধান্ত এই,—

১। ২৭শে জুলাই, ১৮৯২ খ্রীঃ হিন্দু-সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব মহোদয় বরাবরে সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, (সঞ্জীবনী ২৩শে শ্রাবণ, ১২৯৯ ও নব্যভারত বৈশাখ, ১৩০১) এবং শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব মহোদয় যে বহু পণ্ডিতের মত ও শাস্ত্র-বচন সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, (Sea-Voyages among the Hindoos reprinted from the Indian Daily News of Decembar 12, 1891) তাহা বৃহন্নারদীয় পুরাণের ধর্ম্মার্থ-সমুদ্র-গমন-নিষেধের অনুমোদিত না হইলেও, তাহা এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। এমন কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে বাণিজ্য ও শিক্ষাকল্পে বিদেশ গমন-কারী ব্যক্তি প্রত্যাগত হইয়া পাতি-অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিলে তাহার সংস্পর্শ-জনিত দোষে দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যিনি সমাজে উঠিয়াছেন, তাহার সংস্পর্শে আবার পতিত হওয়ার অর্থ কি? বৈদ্য সমাজের অধিকাংশ লোকই একপ সংস্পর্শ-জনিত-দোষে প্রায়শ্চিত্তের বিরোধী। উভয় পক্ষই তাহা স্বীকার করিয়াছেন মনু ২য় ২৪, ৩য়—১৫৮,৫ম—২৮,৫৬, ৭ম—১৯২,৮ম—১৫৭ ও ৪০৯, শ্লোকের মর্ম্ম যাঁহারা অবগত আছেন, অর্থশাস্ত্র ২—২৮, বৃহৎ সংহিতা ৪—৮, ৭-৬, ৯—৩১ বায়ুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ভাগবত পুরাণ (See "A History of Indian shipping &c." page 63) এবং যবদ্বীপ প্রভৃতিতে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন, চাঁদসওদাগরের সমুদ্রে ও ধনপতির সিংহলে গমন, (See কবিকঙ্কণ চণ্ডী) চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, ষ্ট্রাবো ও প্লিনীর বৃত্তান্ত, রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ—১৯৬—২৯৯, ৪র্থ তরঙ্গ ৫০৫, কালিকা পুরাণ ৫৬ ও ৬৭ অধ্যায়, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ (see Sea Voyages among the Hindus, page 15) প্রভৃতির মত যাঁহারা জানেন, এবং ৺অক্ষয় কুমার দত্তের প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা, A History of Indian shipping &c. by Radha Kamud Mukerjee M. A., বঙ্কিম বাবুর ব্যবস্থা ও বিনয়কৃষ্ণের পুস্তিকা যাঁহারা ধীরতা সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা খাদ্যা-খাদ্য এবং সমুদ্র গমন সম্বন্ধে উদারতা অবলম্বন না করিয়া পারেন না। দেশাচার এবং সমাজাচার, দেশ, কাল পাত্রানুযায়ী না হইয়াই পারে না। ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাও হইতে পারে না। উভয় পক্ষই বিদেশ-গমনকারীর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং উভয় পক্ষই স্বীকার করেন, যে ব্যক্তি হইতে সামাজিক

গোল উঠিয়াছে, তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। বিদেশ-গমনকারী যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাঁহার সংস্পর্শ-দোষ হইতে পারে বলিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের কোন প্রমাণ দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত এই—শিক্ষার্থে বিদেশ গমন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়া যিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাঁহার সংস্পর্শ-জনিত দোষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

উভয় পক্ষ এগ্রিমেণ্টে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'উভয় পক্ষ নিজ নিজ মতাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। সামাজিক আহার বিহার তাঁহাদের মধ্যে বহুদিন চলে নাই, এখনও চলিবে না। কিন্তু তাঁহারা আর এজন্য ঝগড়া বিবাদ, মামলা মকদ্দমা করিবেন না।' আমি ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। উভয় পক্ষের গুরু পুরোহিত স্বেচ্ছাক্রমে উভয় পক্ষের কার্য্যাদি করিলে কেহ তজ্জন্য কাহাকে বাধা দিতে বা পীড়ন করিতে পারিবেন না। উভয় পক্ষের লোকেরা স্বেচ্ছামত চলিবেন, কেহ কাহাকে বাধা দিতে বা কলহ বিবাদ করিতে পারিবেন না।

২। সামাজিক গোলের জন্য উভয়পক্ষ যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা উভয়পক্ষ ৭ দিনের মধ্যে আর্জি দিয়া তুলিয়া লইবেন। নিজ নিজ পক্ষের ব্যয় নিজেরা বহন করিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আর শান্তি ভঙ্গ না হয়, সে পক্ষে উভয় পক্ষই চেষ্টা করিবেন।

৩। বিরোধীয় খালে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং তদীয় পক্ষ ৭ দিনের মধ্যে কাটিয়া দিবেন।

৪। বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর খাসের জমীর চাষ রোপণ যে বন্ধ আছে, তাহা শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের পক্ষ ৭ দিনের মধ্যে রোপণ করিতে দিবেন।

৫। ১০৭ ধারার মকদ্দমা উভয়পক্ষ আর্জ্জির দ্বারা ৭ দিনের মধ্যে তুলিয়া নিবেন এবং খালের জন্য যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায়চৌধুরী ৭ দিনের মধ্যে আর্জ্জি দাখিল করিয়া তুলিয়া নিবেন।

৮। উভয়পক্ষ সামাজিক গোলের জন্য আর মামলা মকদ্দমা বা শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবেন না। ৭ই মার্চ্চ, ১৯১৩।

শঙ্কর দর্শন।

স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ শরীর।

উল্লিখিত পঞ্চকোশ বিভাগের অনুকরণে শরীরত্রয়েরও বিভাগ দৃষ্ট হয়:—(১) পঞ্চীকৃত বা মিশ্র অর্থাৎ স্থূল পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর কর্ম্মফল ভোগের আয়তনস্বরূপ। জাগ্রৎকালে বাহেন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল শরীরেই স্থূল বাহ্য পদার্থ সকলের অনুভূতি হয়। "গৃহবৎ গৃহমেধিনঃ"—গৃহস্থের গৃহের ন্যায়,—এই স্থূল শরীর জীবের বাসগৃহ স্বরূপ। জন্ম, জরা, মরণ, এবং স্থূলত্বাদি এই স্থূল শরীরের ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম, নানাপ্রকার রোগ, মান, অপমান, ইত্যাদি স্থূল শরীরেরই অবস্থা ভেদ। (২) অপঞ্চীকৃত বা অমিশ্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন

লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রাণ, আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, বুদ্ধ্যাদি, অবিদ্যা, কাম, এবং কর্ম্ম, এ সমস্তের মিলিত নাম সূক্ষ্ম শরীর। অজ্ঞানবশতঃ বাসনার অধীন হইয়া, এই সূক্ষ্ম শরীরই কর্ম্মফল সকল ভোগ করে। স্বপ্নকালে স্থূল শরীর হইতে পৃথকরূপে, এই সূক্ষ্ম শরীরের অনুভূতি হয়। (৩) আবার সুষুপ্তিকালে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম উভয় শরীর সম্বন্ধেই আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না। অথচ সেই সুষুপ্তিরূপ বীজাবস্থা হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায়, স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরই নির্গত হয়। সুষুপ্তিরূপ এই বীজাবস্থার নাম কারণ-শরীর। "সুখমহস্বাপ্সং"—'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম,' গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, সকলেরই এইরূপ স্মৃতি হয়। স্মৃতি পূর্ব্বানুভূতি-মূলক। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে ঐ সুখানুভূতি বর্ত্তমান ছিল। জাগ্রৎ কালে তাহারই স্মরণ হয়। কূটস্থ আত্মা উক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরত্রয়ের অতীত,—অথচ তাহাদের সাধারণ এবং নিত্য আশ্রয়। এজন্য কূটস্থ আত্মাকে তুরীয় (চতুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ) আত্মা বলা যায়। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত কোশপঞ্চক, অথবা শরীরত্রয় বিভাগের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্রই বলিতে পারি যে, পত্রাদি হইতে পৃথক্ করিয়া মুঞ্জঘাসের পুষ্পদণ্ডের ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনের ন্যায়, দেহমনাদি হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য,—যেন দেহাদিতে অনাসক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখ-বাসনা-জনিত সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপমুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে "প্রণিধান" অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবা, অথবা তুরীয় আত্মার ধ্যান-ধারণা দ্বারা, সেই পরমেশ্বরে অথবা তুরীয় আত্মাতে সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারে*

(৮)। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব বিচার।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সম্বাদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে, শঙ্করাচার্য্য এই দেহেন্দ্রিয়-মন বুদ্ধ্যাত্মক কার্য্যকরণ-পিণ্ডের সম্বন্ধে যে অতি সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিচার করিয়াছেন,—তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষ বিভাগ, অথবা শরীরত্রয় বিভাগের কোন উল্লেখ না করিয়া, কেবল মাত্র দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন দ্বারা আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সেই বিচারের কতক অংশ অনুবাদ করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। জনক প্রশ্ন করিতেছেন:—"হে যাজ্ঞবল্ক্য,

---

* পাতঞ্জল দর্শনে ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগের এই তিনটি অন্তরঙ্গ—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—(১) ধারণা "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য" অর্থাৎ বিষয়ান্তর পরিহার পূর্ব্বক, নাভিচক্রে, হৃদয়পদ্মে, নাসাগ্রে, অথবা অন্য কোন বাহ্য বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণ। (২) ধ্যান "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং।" অর্থাৎ সেই স্থিরচিত্তে প্রত্যয় বা চিন্তার একতানতার নাম ধ্যান। ধ্যেয় বিষয়ের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার পরিহার দ্বারা নিরন্তর সেই ধ্যেয় বিষয়েরই চিন্তা প্রবাহের উৎপত্তির নাম ধ্যান। (৩) সমাধি—"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ,—অর্থাৎ সেই ধ্যানই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, যখন সেই ধ্যেয় বস্তু চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে, যেন চিন্তাপ্রবাহও আপন স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া, স্বরূপ-শূন্যতা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম সমাধি। বিভূতিপাদ ১, ২, ৩। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে পাতঞ্জল বলিতেছেন,—"সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ,"—ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা অথবা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ দ্বারা সমাধি লাভ হয়। সাধনপাদ—৪৫।

আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, বাক্য শান্ত হইলে, এই পুরুষ কোন্ জ্যোতিকে আশ্রয় করে?" যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন:—"আত্মাই তাহার জ্যোতি, সেই আত্ম-জ্যোতিতে সে অবস্থান করে, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করে।"*

ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"জাগ্রৎ"কালে চক্ষুরাদি বহির্মুখ-করণ সকল আদিত্য-জ্যোতি অনুগৃহীত হইলেই এই পুরুষের অর্থাৎ জীবের জাগ্রদ্বিষয় সম্বন্ধে সম্ব্যবহারাদি স্ফুটতর হয়। ইহা দ্বারা দেখা যায় জাগ্রৎকালে, স্বীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারাই এই পুরুষের জ্যোতিঃ-কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়,—যে সমস্ত বাহ্য-জ্যোতি যখন প্রত্যস্তমিত হয়,—যেমন স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালে, এবং ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে, জাগ্রতকালেও,—তখনও স্বীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত কোন প্রকার জ্যোতি দ্বারাই তাহার জ্যোতিঃ কার্য্য সিদ্ধ হয়। স্বপ্নকালে স্বীয় দেহাদি অবয়ব-সঙ্ঘাত ব্যতিরিক্ত জ্যোতি-দ্বারা জ্যোতিঃকার্য্য-সিদ্ধি হইতেও দেখা যায়,—যেমন স্বপ্নে দেহ অচেতন থাকিলেও স্বপ্নকালীন বন্ধু-সঙ্গম-বিয়োগ-দর্শন, বা দেশান্তর গমনাগমনাদি প্রত্যক্ষ হয়। আর সুষুপ্তি হইতে উত্থানান্তেও 'সুখে আমি নিদ্রিত ছিলাম, কিছুরই জ্ঞান ছিল না,'—এইরূপ স্মৃতি হয়। অতএব দেখা যায়, দেহে-ন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতি হইতেও ভিন্ন, কোন জ্যোতিঃ আছে। তবে সেই জ্যোতি কি? আত্মাই তখন (অর্থাৎ স্বপ্নাদিকালে) সেই পুরুষের জ্যোতি হয়। আদিত্যাদির ব্যতিরিক্তত্বের দৃষ্টান্ত হইতে অনুমিত হয় যে, আত্মাও কার্য্য-করণরূপ স্বকীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত,—আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতি যেমন দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত। আত্মা কার্য্য-কারণ সকলের অবভাসক (প্রকাশক), স্বয়ং অন্য কোন ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা অনবভাস্যমান, ইহাই বলা হইতেছে। সেই আত্মজ্যোতি অন্তরস্থ। পারিশেষ্য দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত চলিয়া গেলেও আত্মা পরিশিষ্ট থাকে, অতএব জানা যায় যে, আত্মা-জ্যোতি কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত। কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতের অনুগ্রাহক বাহ্য আদিত্যাদি জ্যোতি যে কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহা চক্ষুরাদি কারণ দ্বারাই উপলভ্যমান দৃষ্ট হয়। অপরদিকে যদিও আদিত্যাদি জ্যোতি এবং বাক্যাদি উপরত হইলে, চক্ষুরাদি দ্বারা চক্ষুরাদি হইতে ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্যোতির উপলব্ধি হয় না, তাহা হইলেও চক্ষুরাদি হইতে ব্যতিরিক্ত সেই আত্ম-জ্যোতির কার্য্য তখনও দেখা যায়,—যে হেতু বাহ্য জ্যোতি উপরত হইলে, সেই পুরুষ আত্ম-জ্যোতিতেই অবস্থান করে, চলে, কর্ম্ম করে, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। ইহা দ্বারা নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই আত্ম-জ্যোতি অন্তরস্থ, অভৌতিক, এবং আদিত্যাদি হইতে ভিন্ন। এজন্যই সেই জ্যোতি চক্ষুরাদির অগম্য।"

অনন্তর শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:—"সমান জাতীয় দ্বারাই সমানজাতীয়ের উপকার দৃষ্ট হয়, অতএব সেই

* "অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং-জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি।" ৩-ব্রা। অ৪-বৃহদারণ্যক।

জ্যোতিঃ অন্তরস্থ এবং আদিত্যাদি ভৌতিক জ্যোতি হইতে অন্য প্রকার,"—একথা বলা ঠিক্ নয়। কেন? উপক্রিয়মান কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাত ভৌতিক। তাহার সমানজাতীয় আদিত্যাদি-সদৃশ ভৌতিক পদার্থ দ্বারাই সেই ভৌতিক কার্য্যকরণ সঙ্ঘাতের উপকার হইতে দেখা যায়। দৃষ্টের অনুরূপই অনুমান করিতে হয়। কার্য্য করণ হইতে ব্যতিরিক্ত, কার্য্য-করণের উপকারক, জ্যোতি বিষয়ে আদিত্যাদির তুল্য, অথচ আদিত্যাদি হইতে ভিন্ন-জাতীয়,—অর্থাৎ অন্তরস্থ, যদি সেরূপ কোন জ্যোতি থাকে, তবে ভৌতিক কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাতের উপকারকত্ব হেতু, তাহাকেও কার্য্য-করণের সমান জাতীয়, অর্থাৎ আদিত্যাদি-জ্যোতির ন্যায় ভৌতিকই অনুমান করিতে হয়। আর যদি অন্তরস্থত্ব, এবং অপ্রত্যক্ষত্ব হেতু চক্ষুরাদি জ্যোতি হইতে সেই জ্যোতির বৈলক্ষণ্য বা ভিন্ন জাতীয়ত্ব অনুমান করা হয়, সে অনুমান অনৈকান্তিক (অর্থাৎ নিশ্চয়তা শূন্য), কারণ চক্ষুরাদি জ্যোতি ও অন্তরস্থ এবং অপ্রত্যক্ষ—(চক্ষু কথনও নিজেকে নিজে দেখে না।) অতএব তুমি যে বলিতেছ:—'দেহাদি হইতে বৈলক্ষণ্য-যুক্ত আত্মজ্যোতি সিদ্ধ হইতেছে,'—এরূপ বলা তোমার মনোরথ মাত্র। বরং যে হেতু কার্য্য-করণ সঙ্ঘাত থাকিলেই মাত্র সেই জ্যোতিও থাকে, অতএব সেই জ্যোতি কার্য্য-করণ সংঘাতেরই ধর্ম্ম, এরূপই অনুমান করিতে হয়। সামান্যতঃ (generally যাহা সত্য দেখা যায়, তাহার সহিত তোমার অনুমানের ব্যভিচারিত্ব (disagreement) হেতু, তোমার অনুমান প্রমাণ-যোগ্য নয়। সামান্যতঃ দৃষ্টের বলেই তুমি প্রমাণ করিতেছ, যে আদিত্যাদির ন্যায় সেই জ্যোতি কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত। প্রত্যক্ষ দৃষ্টকে অনুমান দ্বারা বাধিত করা যায় না। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, যে এই কার্য্যকরণ-সংঘাতই দেখে, শোনে, মনন করে, এবং জানে। যদি কার্য্যকরণ সঙ্ঘাতের উপকারক কোন অন্তর্জ্যোতি থাকে, তবে তাহাও আদিত্যাদির ন্যায়, আত্মা নয়, আদিত্যাদিতুল্য অন্য কোন ভৌতিক জ্যোতি হইবে। এই কার্য্য-করণ সঙ্ঘাতই দর্শনাদির ক্রিয়া করে বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অতএব এই কার্য্যকরণ সঙ্ঘাতই আত্মা হইবে। অন্য কিছু আত্মা নয়। কারণ প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হইলে, অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। যদি বল—এই দেহাদি-পিণ্ড দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা বা আত্মা হইলে, তাহা অবিকল পূর্ব্বরূপ থাকিলেও কেন তাহাতে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কথনও থাকে, এবং কথনও বা থাকে না? ইহাতে কোন দোষ হয় না। কারণ দেহাদিতে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সময়ভেদে দৃষ্ট না হইলেও, যখন তাহা দৃষ্ট হয়, তখন অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না, যেমন খদ্যোতের প্রকাশ প্রকাশকত্ব উভয়ই দৃষ্ট হয় বলিয়া, খদ্যোতের দৃশ্যমান প্রকাশকত্বের অন্য ব্যতিরিক্ত কারণান্তর অনুমান করা যায় না। এরূপ করিলে যে কোন সামান্য (Generalisation) দৃষ্টে সকলই সর্ব্বত্র অনুমান করা যায়। তাহা করা কাহারও অভিপ্রেত নয়। আর পদার্থ মাত্রেরই যে স্বভাব-বিশেষ না আছে, এমন নয়,—যেমন অগ্নির উষ্ণ-স্বভাবতা নিমিত্তান্তর-জনিত নয়, অথবা জলের শীতলতা প্রাণীগণের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অপেক্ষা করে না। এরূপ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরও নিমিত্তান্তরাপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ হউক। তাহা নয়, কারণ তাহা হইলে অনবস্থাদোষ (fallacy of

endless regress) দাঁড়ায়। তাহা কেহ ইচ্ছা করে না।" (২৬—'দেহাত্মবাদ খণ্ডন' দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে অতি বিশদভাবে প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণনা করিয়া, শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন :—"তাহা নয়,—কারণ স্বপ্নেতে এবং স্মৃতিতে পূর্ব্ব-দৃষ্টের দর্শন এবং স্মরণ হইয়া থাকে।" একথাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন :—"স্বভাববাদী বলেন, দর্শনাদি ক্রিয়া দেহেরই কার্য্য, দেহ-ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও নয়। যদি তাহাই হইত, যদি দর্শন ক্রিয়া দেহের কার্য্য হইত, তবে সেই দেহ—যাহাকে দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা কল্পনা করা হইতেছে,—সেই দেহ জাগ্রৎকালে, সচেতন থাকিতে, যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়াছিল, স্বপ্ন কালে যখন সেই দর্শক দেহ অচেতন থাকে, তখন পূর্ব্ব-দর্শকের অভাব অর্থাৎ অচেতনত্ব হেতু সেই বস্তুর সেইরূপ দর্শন লাভ হইত না। চক্ষু নষ্ট হইলে পর, অন্ধ হইয়াও লোকে যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন চক্ষু থাকিবার সময়ে পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিল, অন্ধ হইলেও পরেও স্বপ্নে সেই বস্তু সেই রূপই দর্শন করে, অন্ধ-ব্যক্তি শাকদ্বীপাদি-সম্বন্ধী অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু মাত্র দেখে না। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে :—যে ব্যক্তি চক্ষু নষ্ট হইলে পরেও স্বপ্নে পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু দেখে, সেই চক্ষু থাকিতে (অর্থাৎ অন্ধ হইবার পূর্ব্বে) তাহা দেখিয়াছিল, চক্ষু বা দেহ দেখে নাই। যদি দেহ বা চক্ষু দ্রষ্টা হইত, তবে যে চক্ষু তাহা দেখিয়াছিল, সেই চক্ষু উৎপাটিত হইলে পর, সেই উদ্ধৃত-চক্ষু অন্ধ অন্য স্বপ্নে সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু দেখিত না। লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে :—'পূর্ব্বে আমি হিমালয়ে শৃঙ্গে দেখিয়াছিলাম (ইহাতে অনুমান হয়, শঙ্কর হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই), অদ্য স্বপ্নে তাহা দেখিলাম, উদ্ধৃত-চক্ষু অন্ধদিগেরও এইরূপ অনুভব হয়। এতএব চক্ষু উদ্ধৃত হইলে পর স্বপ্নে যে পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু পূর্ব্ববৎ দর্শন করে, চক্ষু অসুস্কৃত অবস্থায়ও সেই দ্রষ্টা। চক্ষু বা দেহ দ্রষ্টা নয়, জানা গেল। আবার স্মৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যায়:—যে দ্রষ্টা সেই স্মর্ত্তা। দ্রষ্টা এবং স্মর্ত্তা এক। এ জন্যই দ্রষ্টা চক্ষু দ্বারা পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিল, চক্ষু নিমীলিত করিয়াও, স্মৃতি পটে সে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু পূর্ব্ববৎ দর্শন করে। চক্ষু নিমীলিত করিয়া যে দ্রষ্টা স্মৃতিপটে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর রূপ পূর্ব্ববৎ দর্শন করে, সেই দ্রষ্টাই চক্ষু দ্বারা তাহা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল। চক্ষু দ্রষ্টা নয়, ইহাই জানা যায়। আর মৃত্যুর পর, অবিকল পূর্ব্বরূপ থাকিলেও, দেহ রূপাদি দর্শনে অক্ষম হয়। সেই দ্রষ্টা হইলে, মৃত্যুর পরেও দেহে দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকিত। এতএব যাহার অপায় হইলে, দেহে দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকে না, এবং যাহা থাকিলে দেহে দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকে, তাহাই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা। দেহ দর্শনাদির কর্ত্তা নয়, জানা যায়। পুনরায় এতদ্দ্বারাও দেখা যায়, চক্ষুরাদি দর্শনাদির ক্রিয়ার কর্ত্তা নয়। যাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহা আমিই স্পর্শ করিতেছি,—অর্থাৎ যে দ্রষ্টা, সেই স্প্রষ্টা। দর্শন এবং স্পর্শনের ভিন্ন কর্ত্তৃকত্ব সম্ভবী হইলে, আমাদের এরূপ একত্ব অনুভব হইত না। যদি বল তবে মনই কর্ত্তা,—তাহাও নয়, কারণ মনই গ্রাহ্য বিষয় (অথবা বৃত্তি) মাত্র, রূপাদিরই তুল্য। মনও দর্শনাদির ন্যায় কার্য্য মাত্র, অতএব মনেরও দ্রষ্টৃত্বাদি

কল্পনা অসঙ্গত। যে দ্রষ্টা, সেই শ্রষ্টা, সেই মন্তা, (অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, এবং মননাদি কার্য্য, এবং চক্ষু, ত্বক, এবং মনাদি করণ,—এই সমস্ত হইতে ব্যতিরিক্ত এক আত্মাই সকলের কর্ত্তা)। এতএব সিদ্ধ হইতেছে, সেই আত্ম-জ্যোতি অন্তবস্থ, এবং আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতিব ন্যায় দেহেন্দ্রিয়মনাদি হইতে ব্যতিরিক্ত।"

"আবার যে বলা হইয়াছে,'সমান জাতীয় বা ভৌতিক আদিত্যাদি দ্বারাই কার্য্যকরণ-সংঘাতের উপক্রিয়মানত্ব দৃষ্ট হয়, অতএব সেই অন্তবস্থ জ্যোতি ও কার্য্যকরণাদির সমান জাতীয়, অর্থাৎ ভৌতিক অনুমান করাই সঙ্গত,'—তাহা সত্য নয়। উপকার্য্য এবং উপকারক ভাবের মধ্যে সেরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। সমান জাতীয় পার্থিব ইন্ধনাদি দ্বারা যেমন অগ্নি-প্রজ্বলনের উপকার হয়, সেইরূপ ভিন্নজাতীয় জল দ্বারাও বৈদ্যুতাগ্নি এবং জঠরাগ্নি প্রজ্বলনের উপকার হইতে দেখা যায়। অতএব উপকার্য্য এবং উপকারক ভাব সম্বন্ধে সমানজাতীয়-অসমানজাতীয় কোনরূপ নিয়ম নাই। কখনও সমানজাতীয় মনুষ্যাদি দ্বারা মনুষ্যাদির উপকার হয়। কখনও বা স্থাবর বা পশ্বাদি ভিন্নজাতীয়দ্বারা উপকার হয়।" আত্মজ্যোতি যে কার্য্য-করণ সংঘাতের ধর্ম্ম নয়, এবং কার্য্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহা প্রতিপাদন জন্য শঙ্কর পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন:—"সেই জ্যোতি কার্য্যকরণ সংঘাতেরই ধর্ম্ম, এই যে বলা হয়, তাহা হইতে পারে না, 'কারণ তাহাতে অনুমান বিরোধ,—'আদিত্যাদি জ্যোতির ন্যায় সেই জ্যোতিও কার্য্যকরণ সংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত'—এই অনুমানের সহিত বিরোধ। 'আত্ম-জ্যোতির কার্য্য-করণ-ধর্ম্মত্ব' প্রতিপক্ষের প্রতিপাদ্য (প্রতিজ্ঞা)। কিন্তু যেহেতু মৃত্যুর পর আত্মজ্যোতির অদর্শন হয়, অতএব দেহরূপ কার্য্যকরণ-পিণ্ডের সহিত আত্ম-জ্যোতির তদ্ভাবভাবিত্ব অসিদ্ধ। স্বপ্ন এবং স্মৃতি হেতু দ্রষ্টা দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু (অর্থান্তর-ভূত) প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যে খদ্যোতাদির কাদাচিৎক প্রকাশাপ্রকাশকত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক্ নয়, কারণ পক্ষাদি অবয়বের সঙ্কোচ এবং বিকাশই তাহাদের সেই প্রকাশাপ্রকাশকত্বের নিমিত্তভূত হেতু। অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ব্যতিরিক্ত অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতি আছে॥"

(২) বৃহদারণ্যক ভাষ্যে বুদ্ধ্যাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচার।

পরের মন্ত্রে আবার জনক প্রশ্ন করিতেছেন:—"কোনটী আত্মা"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন:—'প্রাণ সকলের (Vital functions and organs) মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় হৃদি-স্থিত অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ পুরুষ।" * ৭॥

ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"যদিও আত্মার ব্যতিরিক্তত্বাদি সিদ্ধ হইল, তথাপি আদিত্যাদির অনুগ্রাহকত্ব (অর্থাৎ আদিত্য চক্ষুর অনুগ্রাহক এবং চক্ষুর ন্যায় ভৌতিক জাতীয়) দৃষ্টে সমানজাতীয়েরই অনুগ্রাহকত্ব সম্ভব, এরূপ ভ্রান্তি হেতু,—বুঝিতে পারা যাইতেছে না যে, কি আত্মা বুদ্ধ্যাদি করণ সকলেরই সমানজাতীয়, এবং তাহাদেরই অন্যতম, অথবা সে সকল হইতে ব্যতিরিক্ত। এজন্যই প্রশ্ন হইতেছে:—

* "কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।

'কোন্‌টী আত্মা' ? (আত্মা-অনাত্মার) বিচার সূক্ষ্ম এবং দুর্বিজ্ঞেয়, এজন্য ভ্রান্তি সম্ভবপর। অথবা শরীর মনাদি হইতে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইলেও, বিচার দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে আত্মার ব্যতিরিক্তত্বের অনুপলব্ধি হেতু, আপাততঃ মনে হয় যেন ইন্দ্রিয়মনাদি করণ গ্রাম—সকলই বিজ্ঞান-যুক্ত। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে :—"কোন্‌টী আত্মা" ? দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনের মধ্যে কোন্‌টী সম্বন্ধে তুমি "যে জ্যোতি দ্বারা অবস্থান করে ইত্যাদি বলিতেছ,—অর্থাৎ কোন্‌টীকে তুমি আত্মা নামে অভিহিত করিতেছ ? অথবা উক্ত শ্রুতি বাক্যের এরূপ অর্থও হইতে পারে :—"তোমার অভিপ্রেত সেই আত্মা কি বিজ্ঞানময় ? এই সমস্ত প্রাণই (Vitality) যেন বিজ্ঞানময় বোধ হয়, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী আত্মা ?" ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইলে যেমন বলা হয়,—ইহারা সকলেই তেজস্বী বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে কে ষড়ঙ্গবিৎ ?" প্রথোমোক্ত ব্যাখ্যাতে "কোন্‌টী আত্মা" ? এই মাত্রই প্রশ্ন বাক্য, এবং "এই যে বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি তাহার প্রতিবচন। শেষোক্ত ব্যাখ্যাতে—"প্রাণ সকলের মধ্যে কোন্‌টী এই বিজ্ঞানময় আত্মা", এই পর্য্যন্তই প্রশ্ন বাক্য। অথবা "কোন্‌টী সেই আত্মা বা প্রাণ সকলের মধ্যে হৃদিস্থিত অন্তর্জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ" এই সমস্তই প্রশ্ন বাক্য হইতে পারে। বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত আত্মার সম্বন্ধের অবিবেক হেতু, আত্মাকে বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞান-বহুল বলা হইতেছে, কারণ বুদ্ধি-বিজ্ঞান-সংযুক্তরূপেই আত্মার উপলব্ধি হয়, যেমন আদিত্য এবং চন্দ্র সংযুক্তরূপেই রাহুর উপলব্ধি। বুদ্ধিকে সর্ব্ব বস্তু উপলব্ধির যন্ত্র স্বরূপ—"সর্ব্বার্থকরণং" বলা যায়,—যেমন অন্ধকারে সম্মুখস্থিত প্রদীপ। এজন্য উক্ত হইয়াছে, মন দ্বারাই দেখে, মনদ্বারাই শোনে।" (এস্থলে মন-বুদ্ধি এক মনে করা হইতেছে) ; অন্ধকারে সম্মুখস্থ প্রদীপালোক-বিশিষ্ট বস্তুর ন্যায়, বুদ্ধি-বিজ্ঞান দ্বারা আলোক-বিশিষ্ট হইলেই সমস্ত বিষয়জাতের উপলব্ধি হয়। অপর সকল করণ (ইন্দ্রিয়াদি) বুদ্ধিরই দ্বার মাত্র। এজন্যই 'বিজ্ঞানময়' এই বিশেষণ দ্বারা (আত্মাকে) বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ বিশেষণযুক্ত করা হইতেছে। "বিজ্ঞান" শব্দে এস্থলে কেহ কেহ 'পরমাত্মবিজ্ঞপ্তি-বিকার' বা 'পরমাত্মার জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশভেদ, এরূপও অর্থ করেন। কিন্তু পরে 'এই ধী' এরূপ পাঠ আছে। "হৃদ্যন্তর্" বা হৃদয় মধ্যে, এই কথা দ্বারাও 'বিজ্ঞানময়' শব্দের বিজ্ঞান-প্রাচুর্য্য বা বিজ্ঞান-বাহুল্য অর্থই নিশ্চিত। প্রাণ (animal vitality) হইতে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনার্থ—"প্রাণেষু" এই সপ্তমী প্রয়োগ। যাহার মধ্যে যে থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন, যেমন 'পাষাণের মধ্যে বৃক্ষ।' 'প্রাণেষু' বলাতে ভ্রম হয়, যে বুদ্ধি ও প্রাণজাতীয়, এজন্য বলা হইতেছে, 'হৃদ্যন্তর' বা হৃদয় মধ্যে। হৃৎ শব্দ দ্বারা পুণ্ডরীকাকার মাংসপিণ্ডকে লক্ষ্য করে, তথায় অবস্থিত, এজন্য বুদ্ধিকেই 'হৃৎ' বলা হইতেছে। বুদ্ধি হইতে (আত্মার) ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনার্থ 'অন্তর্—বা (বুদ্ধি) 'মধ্যে বলা হইতেছে। অবভাসাত্মকত্ব বা সকলের প্রকাশকত্ব হেতু আত্মাকে 'জ্যোতি' বলা হইতেছে।

আদিত্যাদি দ্বারা প্রকাশিত ঘটাদির ন্যায়,—সেই প্রকাশ-স্বভাব আত্ম-জ্যোতির প্রভাবেই, এই দেহাদি কার্য্যকরণ পিণ্ড চেতনাবানের ন্যায় অবস্থান করে, চলে, কর্ম্ম করে। অথবা মরকতমণির ন্যায়। পরীক্ষার জন্য ক্ষীরাদি

দ্রব্যে প্রক্ষিপ্ত মরকতমণি যেরূপ ক্ষীরাদিকেও আপনার ছায়ার ন্যায় করে, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি হইতে সূক্ষ্মতমত্ব, এবং সর্ব্বান্তরতমত্বহেতু, সেই হৃদ্যন্তঃস্থ আত্ম-জ্যোতিও বুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্যকরণসংঘাতকে সূক্ষ্মত্ব-স্থূলত্বের পারম্পর্য্যানুসারে একত্রে সেই আত্ম-জ্যোতির ছায়াযুক্ত করে। অতি স্বচ্ছত্ব এবং আত্মার নিকট-তমত্বহেতু, বুদ্ধি সেই আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ হয়। এজন্য বিবেকবান্-দিগেরও সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিতেই আত্মত্বাভিমান বুদ্ধি হয়। বুদ্ধি হইতে মনের আনন্তর্য্য হেতু, বুদ্ধি-সম্পর্ক-জন্য মনও সেই চৈতন্যের ছায়া-স্বরূপ হয়। তৎপর মনের সহিত সংযোগ হেতু ইন্দ্রিয়াদিও সেই চৈতন্যের ছায়াস্বরূপ হয়। তদনন্তর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক হেতু শরীর ও চৈতন্যের ছায়া লাভ করে। এইরূপে সেই আত্ম-চৈতন্য জ্যোতি পারম্পর্য্যানুসারে সমস্ত কার্য্য-করণসংঘাতকে তাহার চৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা অবভাসিত করে। এজন্যই এই কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে এবং তদীয় বৃত্তি সমূহে সর্ব্বদা লোকের আত্মত্বাভিমান বুদ্ধি জন্মে। লোকের যাহাতে আত্মানাত্মবিবেক লাভ হয়, সেজন্য গীতাতে ভগবান্ বলিতেছেন :—"এই সূর্য্য যেমন একাকী এই লোক সকল প্রকাশ করে, হে ভারত, ক্ষেত্রী বা আত্মাও সেইরূপ এই সমস্ত ক্ষেত্র বা বিষয়জাত প্রকাশ করে। এই কারণে সেই হৃদ্যন্তঃস্থ জ্যোতিকে পুরুষ বলা যায়,—আকাশবৎ সর্ব্বগতত্ব হেতু পূর্ণ,—অতএব পুরুষ।"

(৩) বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আত্মার স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব এবং বুদ্ধ্যাদির সহিত সমানকারতা।

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বা স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার উক্ত ভাষ্যে বলিতেছেন :—"আত্মা সকলের অবভাসক, এবং স্বয়ং অন্যের অনবভাস্য। এ জন্যই আত্মার স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব নিরতিশয় বা পূর্ণ। 'কোনটী আত্মা' বলিয়া যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, সেই পুরুষ স্বয়ংই জ্যোতিঃস্বভাব। করণ সকলের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতি সকল প্রত্যস্তমিত হইলে, আত্মা বা হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ স্বয়ংই বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা করণ সকলের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতি পরতন্ত্র, অর্থাৎ আত্মচৈতন্য সাপেক্ষ, আত্ম-চৈতন্যের অভাবে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম। এজন্য আদিত্যাদি বাহ্য অনুগ্রাহক থাকিলেও, যদি তখন কার্য্য-করণ-সংঘাত আত্মচৈতন্য-রহিত হয়, তখন তাহা স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হয়। কিন্তু আত্মার জ্যোতি আদিত্যাদির ন্যায় পরতন্ত্র নয়। আত্মা নিজেই নিজের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম। আত্ম-জ্যোতির অভাব হইলে, কার্য্য-করণ সংঘাত ব্যবহারের অযোগ্য হয়। আত্মজ্যোতির অনুগ্রহেই সর্ব্বদা সর্ব্ব সদ্ব্যবহার সম্ভব। শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে—"এই যে হৃদয়, মনও তাহাই, সংজ্ঞানস্বরূপ"—ইত্যাদি। প্রাণীগণের সর্ব্ব সদ্ব্যবহার আত্মত্ব-অভিমান-যুক্ত, মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মত্ব অভিমানের হেতু উক্ত হইয়াছে। প্রাণীগণের এইরূপ আত্মত্বাভিমান থাকিলেও সেই আত্ম-জ্যোতি স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। জাগ্রৎ-কালে বাহ্যাভ্যন্তরীণ কার্য্যশৃঙ্খলেতে বুদ্ধ্যাদির ব্যাকুলত্ব হেতু, বুদ্ধ্যাদি ও সেই আত্মজ্যোতির গ্রহণে অসমর্থ। এজন্য মুঞ্জবীর (Saccharum Sara) হইতে তাহার ইষীকার বা পুষ্পদণ্ডের Inflorescence) ন্যায় পৃথক্ করিয়া আত্ম-জ্যোতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে, উপনিষদ্ তাহা স্বপ্নে প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইতে-ছেন :—"সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বরূপ আত্মা

সকলের সহিত সমানাকার হইয়া (অর্থাৎ সর্ব্বাকারে) উভয় লোকে সঞ্চরণ করে।"*—কি সূত্রে সমানাকার বা একরূপত্ব? বুদ্ধি সূত্রে। বুদ্ধি অবভাস্য, সেই আত্মজ্যোতি তাহার অবভাসক। যেহেতু হৃৎশব্দবাচ্য বুদ্ধিই আত্মার নিকটতম, এবং বুদ্ধিতেই আত্মার ক্রিয়াবত্ত্ব, অতএব বুদ্ধি দ্বারাই আত্মার সমানাকারতা। তাহা কিরূপ? অশ্ব হইতে মহিষের বিবেকের ন্যায় বুদ্ধি হইতে ভিন্নরূপে আত্মার অনুপলব্ধি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—যেমন আলোক সম্বন্ধে অবভাস্য ঘটাদি এবং অবভাসক আলোকের পৃথক্‌ভাবে অনুপলব্ধি লোক-প্রসিদ্ধ। আলোকের বিশুদ্ধত্ব হেতু আলোক তাহার অবভাস্য ঘটাদির সদৃশাকারে প্রকাশিত হয়। আলোক যখন রক্তবর্ণ বস্তু প্রকাশ করে, তখন রক্ত সদৃশ হয়। অথবা যখন হরিত, নীল বা লোহিত বস্তু প্রকাশ করে, আলোক তখন নীলাদি সদৃশ হয় †। আত্ম-জ্যোতিও সেইরূপ বুদ্ধিকে আলোকিত করিয়া, বুদ্ধির সহিত সমানাকার হইয়া, বুদ্ধিদ্বারা সমস্ত বিষয়জাত (ক্ষেত্র) প্রকাশ করে। মরকত মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বলা হইয়াছে। এ জন্যই বলা হইয়াছে—"সমানঃ সন্"—বুদ্ধির সর্ব্ব-সমানতা দ্বারা আত্মা সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাকার হয়। আত্মাকে কোন বস্তু বিশেষ হইতে প্রবিভক্ত করিয়া মুঞ্জবাস (S. Sara) হইতে তাহার ইষীকার (Inflorescence) ন্যায়—পৃথক্‌ভাবে আত্মজ্যোতিরূপে প্রদর্শন করিতে না পারা যাইবার ইহাই কারণ। আত্ম-জ্যোতির ধর্ম্ম নাম-রূপেতে, এবং নাম রূপের ধর্ম্ম আত্ম-জ্যোতিতে,—এই অন্যোন্যাধ্যাস দ্বারা সকল ব্যাপার আত্মাতে অধ্যারোপ করিয়া, লোক সকল মোহ-প্রাপ্ত হয়, এবং 'এই সেই আত্মা' সেই আত্মা এই নয়,' 'আত্মার ধর্ম্ম এইরূপ, 'আত্মার ধর্ম্ম এইরূপ নয়,' "আত্মা কর্ত্তা, 'আত্মা কর্ত্তা নয়,' 'আত্মা শুদ্ধ,' 'আত্মা শুদ্ধ নয়,' "আত্মা বদ্ধ,' "আত্মা মুক্ত,' আত্মা স্থির থাকে,' 'আত্মা গমনাগমন করে,' 'আত্মা অস্তি,' 'আত্মা নাস্তি'—ইত্যাদি নানা প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকে। এই সকল কারণে বলা হইতেছে :—'সকলের সহিত সমানাকার হইয়া আত্মা উভয় লোকে সঞ্চরণ করে।' উভয় লোকে বলিতে প্রাপ্ত এবং প্রাপ্তব্য, অথবা ইহ এবং পরলোক গৃহীত হইতেছে। এক দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত পরিত্যাগের পর অন্য দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতের গ্রহণ—পুনঃ পুনঃ এইরূপ শৃঙ্খলবন্ধের ন্যায় শত অবস্থার ভিতর দিয়া আত্মা একের পর অন্যতে সঞ্চরণ করে। বুদ্ধির সহিত সাদৃশ্যই আত্মার উভয় লোক সঞ্চরণের হেতু। আত্মা স্বতঃ কোনরূপ ভেদযুক্ত নয়। বুদ্ধ্যাদির সমানাকার হওয়াতেই আত্মা বুদ্ধিযোগে পর্য্যায়ক্রমে উভয় লোকে সঞ্চরণ করে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির পর্য্যায়েও তাহাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়। উপনিষদ্‌ও তাহাই দেখাইতেছে :—"ধ্যায়তীব" —যেমন ধ্যান বা চিন্তা করিতেছে, অর্থাৎ ধ্যান ব্যাপারবতী বুদ্ধিকে তৎস্থিত আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতির্দ্বারা আলোকিত করিয়া, বুদ্ধি-সদৃশ হইয়া, আত্মও যেন ধ্যান করিতেছে, এরূপ দেখায়। ঘটাদি সম্বন্ধে

---

* "সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব

† Note how correctly the ancients anticipated the relation between colourless or white light, and the seven colours,—red, orange, yellow, green, indigo, blue, and violet

আলোকের ন্যায়। এজন্যই লোকের ভ্রম জন্মে,—যেন আত্মাই চিন্তা করিতেছে। পরমার্থতঃ আত্মা ধ্যান করিতেছে, এরূপ নয়। আবার বুদ্ধ্যাদি করণ বা প্রাণাদি বায়ু চঞ্চল হইলে, বুদ্ধ্যাদির অবভাসক হেতু আত্মাও তৎসদৃশ দেখায়—যেন আত্মা ও চঞ্চল—"লেলায়তীব"। কিন্তু পরমার্থতঃ সেই আত্মজ্যোতি চলনধর্ম্মশীল নয়।"

"বুদ্ধ্যাদির সহিত সমানত্ব ভ্রান্তিই যে আত্মার উভয় লোক সঞ্চরণের হেতু, আত্মা যে স্বতঃ সেরূপ নয়—ইহা কিরূপে জানা যায়? ইহাই প্রদর্শনজন্য প্রমাণ উপদিষ্ট হইতেছে:—"যেহেতু সেই আত্মা স্বপ্নরূপে যখন যে বুদ্ধির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তখন যে যে আকার ধারণ করে, আত্মাও যেন সেই সঙ্গে সেই সেই আকার ধারণ করে। এজন্য বলা হইতেছে:—বুদ্ধি যখন স্বপ্নবৃত্তি লাভ করে, সেই সঙ্গে আত্মার স্বপ্নবৃত্তি লাভ করে। আবার বুদ্ধি যখন জাগরিত-বৃত্তি গ্রহণ করে, আত্মাও তাহাই করে। এই হেতু বলা হইয়াছে "স্বপ্নো ভূত্বা"* বা যখন স্বপ্নবৃত্তিকে অবভাসিত করে, তখন স্বপ্নবৃত্তির আকার গ্রহণ করিয়া, এই জাগরিত ব্যবহারাত্মক বা কার্য্য-করণ-সংঘাতাত্মক, অথবা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ব্যবহারাত্মক,—এই লোক অতিক্রম করিয়া গমন করে। তদ্দারা আত্মা যে এই কার্য্যকরণ-সংঘাত হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ ভূত, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আত্মা তখন স্বীয় আত্মজ্যোতির্দ্বারা স্বপ্নাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তিকে আলোকিত করিয়া অবস্থান করে। যেহেতু এইরূপ হয়, অতএব সেই আত্মা বিশুদ্ধ এবং স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বভাব। অতএব সেই আত্মা কর্ত্তৃ-ক্রিয়া-কারক, এবং ক্রিয়া-ফলাদি লৌকিক ভেদ-শূন্য। প্রকৃত পক্ষে ধী-সাদৃশ্যই আত্মার উভয়লোক সঞ্চারাদি সম্ভারহার-ভ্রান্তির হেতু। কার্য্যকরণ-সংঘাতকে "মৃত্যোঃ রূপাণি" বলা হইতেছে। মৃত্যু বলিতে 'সকাম কর্ম্ম' (অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক ফল কামনা করিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয়), অথবা 'অবিদ্যাকে' লক্ষ্য করে। মৃত্যুর স্বকীয় অন্য কোন প্রকার রূপ নাই। এই কার্য্য-করণ-সংঘাতেই তাহার রূপ, কারণ এই কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতই ক্রিয়া বা সকাম কর্ম্মের, এবং ক্রিয়া-ফলের আশ্রয় ভূত। এজন্যই বলা হইতেছে, স্বপ্নে মৃত্যুর রূপ, অর্থাৎ এই জাগরিত ব্যবহারাত্মক লোক অতিক্রম করে।"

(৪) বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধদার্শনিকগণ।

অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুশীলনের ফলে বুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি। যে বৌদ্ধকে পৌরাণিকগণ 'হৈতুক' 'পাষণ্ড'দিগের দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আজ আমরা সেই বুদ্ধকে যথার্থই "এসিয়ার প্রদীপ" কেন,—জগতের প্রদীপ বলিয়া জানিতে পারিতেছি। বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। তাঁহাকেও ঋষি বা দ্রষ্টা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র দ্রষ্টা বলিলেও তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ তিনি মহাপ্রেমিক এবং কর্ম্মপথের পথিক ছিলেন। যাঁহারা জ্ঞান দৃষ্টিতে মাত্র দেখিয়াছিলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," বা "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি," "সকলই এক অদ্বিতীয় আত্মার প্রকাশ,"—কিন্তু কার্য্য-কালে—("শ্বযোনিং বা শূকর-যোনিং বা চণ্ডাল-যোনিং বা," শুনি চৈব শ্বপাকেচ")—যাঁহারা 'শূকর-কুকুরের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে

* সেহি সপ্নোভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি।

চণ্ডালের উল্লেখ করিতে লজ্জিত হন নাই,—বুদ্ধদেবকে তাহাদের সমশ্রেণীর সিদ্ধ-পুরুষ বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। "রাগ-দ্বেষ-মোহের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বপ্রেম লাভের আকাঙ্ক্ষা ,কোনও জীবের অকল্যাণ না করিবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যায় অত্যাচার নিবারণের আকাঙ্ক্ষা, এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি সাধনের আকাঙ্ক্ষা"—বুদ্ধের মতে ইহাই যথার্থ পুরুষার্থ।* বুদ্ধ জীবন্মুক্তির ঋষি, জীবন্মুক্তির প্রকৃত তত্ব যিনি দর্শন করিয়াছিলেন। শুধু দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি স্বয়ং সেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আচণ্ডাল বিশ্বমানবের নিকটে সেই তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং হস্তধারণ করিয়া বিশ্বমানবকে সেই পথে লইয়া চলিয়াছেন। তিনি স্বয় বিশ্বপ্রেমের অতুল জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া, বিশ্বমানবের হৃদয়ে সেই প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। "মাতা যেমন তাহার একটী মাত্র সন্তানের রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন, সেইরূপে সর্ব্বজীবে প্রেম সাধনা করিবে," "সকলের প্রতি প্রেম,পরের দুঃখে দুঃখ, পরের সুখে সুখ, এবং নিজের সুখ-দুঃখে সমত্বই ব্রহ্ম-বিহার"—এই সকলই তাঁহার অমূল্য উপদেশ।

অপরদিকে যে সকল বাক্য লইয়া বিবাদ করিয়া লোক-সমাজ বিদ্বেষানলে দগ্ধ হয়, বুদ্ধ আপনাকে সে সকল বাক্যজাল হইতে দূরে রাখিতেন। চিত্ত সমাহিত করিয়া দেখ কি আছে, বৃথা 'পরমাত্মা' 'ঈশ্বর' ইত্যাদি বাক্য লইয়া বিরোধ করিওনা। এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় তিনি 'পরমাত্মা' 'ঈশ্বর' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করেন নাই। তিনি বাক্য-মনের অগোচর—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব,—স্বীকার অস্বীকার কিছুই করেন নাই। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধি-মন হইতে ভিন্ন, পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা বা 'আমির' অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন :—কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ যেমন দেখিয়াছিলেন, অথবা মুসলমান সুফিগণ* যেমন দেখিয়াছিলেন—*(২) অথবা খ্রীষ্টশিষ্য ঋষি পল ("Know ye not, ye are the temple of the Lord)" যেমন দেখিয়াছিলেন, যে ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ আমিত্ব-ভ্রান্তিই সমস্ত অজ্ঞানতার এবং রাগ-দ্বেষ-মোহের মূল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জীবন্ত বিশ্বপ্রেমের প্রভাব সেই পৃথক্ ব্যক্তিগত আমিত্ব-ভ্রান্তি দূর হইলেই মুক্তি বা নির্ব্বাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাহার মতে জীবিতকালেই সেই মুক্তি বা (রাগদ্বেষমোহের) নির্ব্বাণ লাভ করিতে হয়।

কালক্রমে বুদ্ধ-প্রদর্শিত সেই জীবন্ত সাধনালব্ধ বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ম্লান হইলে পর, আত্মার এবং বিশ্বের অস্তিত্ব লইয়া বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঘোর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল। তখনই বৌদ্ধ দার্শনিকদিগেরও অভ্যুদয় হয়। বুদ্ধদেব দেহেন্দ্রিয়-মনবুদ্ধ্যাদির অতীত ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ "আমির" বা জীবাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন†। কিন্তু

* (১) See the Dialogues of the Buddha &c. by Rhys Davids

* (২) "না তোমার অস্তিত্ব বলায় অধিকার, না অনস্তিত্ব বলায় অধিকার।" স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেনের তাপস মালা, ৩—৭৪।

† The beliefin personal or individual souls may have been treated by Buddha as a relic of animism prevailing among primitive man

তিনি বিনাশবাদী বা শূন্যবাদী ছিলেন না। তাঁহার মত যে যাহারা দেহ থাকিতে জীবন্মুক্তি লাভ না করে, মৃত্যুর পর তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম বা অতৃপ্ত বাসনানুসারে দেহান্তর গ্রহণ করে। ইহাতে দেখা যায়, যদিও তিনি ব্যক্তিগত জীবাত্মার ভেদ অস্বীকার করিতেন, তথাপি তিনি লোকান্তরে পর্য্যন্ত ব্যক্তিভেদ (Personal identity) স্বীকার করিতেন। তিনি যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম এবং কৃচ্ছ্রাদিসাধন নিরর্থক মনে করিতেন। লৌকিক সুকৃত-দুষ্কৃতেরই মাত্র পারলৌকিক ফল, তিনি স্বীকার করিতেন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। তাঁহার সাধন জীবন্ত,—বস্তুগত, বাক্যগত ছিল না। তিনি নামীর প্রয়াসী, নামের প্রয়াসী ছিলেন না। ধ্যান এবং চিত্ত সমাধানই তাঁহার, এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যদিগের বিশেষ সাধনা ছিল। তাঁহারা কাঁহার ধ্যান করিতেন, কাঁহার মধ্যে চিত্ত-সমাহিত করিতেন? বুদ্ধের বহুকাল পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বুদ্ধের এই জীবন প্রহেলিকা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পরমাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতাকেই "নাস্তিতা" মনে করিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয়ই অস্বীকার করিয়া সংশয়বাদের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন,—বিখ্যাত মিলিন্দ-নাগসেনের কথোপকথন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তখন জীবন্ত বিশ্বপ্রেমের বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত প্রায়। তাহার পরিবর্ত্তে 'হৈতুক' 'পাষণ্ড' (৩) * নামে অভিহিত নীরস্ তর্কপ্রিয় বৌদ্ধদার্শনিকদিগের সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদার্শনিকদিগের মত সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিতেছেন :—"(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক, এবং (৪) বৈভাষিক,—এই সকল নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগণ যথাক্রমে (১) সর্ব্বশূন্যবাদ, (২) বাহ্যশূন্যবাদ, (৩) বাহ্য বস্তুর অনুমেয়ত্ব, এবং (৪) বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব মত আশ্রয় করেন"। তিনি বলেন, "সুগতই বৌদ্ধদিগের দেবতা, এবং বিশ্বসংসার তাহাদের মতে ক্ষণ-ভঙ্গুর।" তিনি আবার বলিতেছেন :—"বৌদ্ধগণ বৈভাষিকাদি চারিটী প্রস্থান বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে (১) বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তু এবং তৎবিষয়ক জ্ঞান, উভয়ই স্বীকার করেন, (২) সৌত্রান্তিকগণ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু স্বীকার করেন না, (৩) যোগাচারগণ বুদ্ধির সহিত আকারের যোগই মাত্র স্বীকার করেন, এবং (৪) মাধ্যমিকগণের মতে কেবল মাত্র সংবিৎ বা জ্ঞানই আপনার মধ্যে আপনি বর্ত্তমান" †। উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয় ভিন্ন আরও নানাপ্রকার বৌদ্ধ দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অতি সঙ্কীর্ণ। মূল বৌদ্ধগ্রন্থসকল সাধারণ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান

* (৩) "উদগৃহীত-লিঙ্গধর্ম্মেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাং ধর্ম্মইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্ন-রক্তপটাদিষু"—ইত্যের পরিত্যক্ত 'নগ্ন (জৈন), রক্তপট (বৌদ্ধ) প্রভৃতি পাষণ্ডদিগের উপধর্ম্মে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি'। স্কন্ধ ৪—অ ১১-১৮। শ্রীমদ্ভাগবত।

† "তে চ মাধ্যমিক-যোগাচার-সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা বৌদ্ধা যথাক্রমং সর্ব্বশূন্যত্ব বাহ্যশূন্যত্ব-বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠন্তে।

"বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরং।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ
অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহুমন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষ গ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ।
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন।

ন্যায়ের কোন সম্ভাবনা নাই। অধুনা বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিতেছি, তাহা তাহাদের প্রতিপক্ষ পৌরাণিক অথবা দার্শনিকদিগের বর্ণনা হইতেই সংগৃহীত। এরূপ অবস্থায় যে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের প্রতি অবিচার হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কালে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহাদেরই সঙ্গে শঙ্করের সময়ে সময়ে বিচার করিতে হইয়াছিল। এজন্য শঙ্কর তাঁহার বৃহদারণ্যকভাষ্যে বৌদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। 'সর্ব্বশূন্যবাদ', 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ', 'বাহ্যার্থবাদ', 'ক্ষণ-ভঙ্গ বাদ',—শঙ্কর একে একে এই সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মনবুদ্ধ্যাদি হইতে স্বতন্ত্র অন্তরতম আত্ম-জ্যোতির অস্তিত্ব বিষয়ে বৌদ্ধদিগের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:—"কিন্তু বুদ্ধির সমানাকার, অথচ বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, এবং বুদ্ধির অবভাসক কিছুই নাই। প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানদ্বারা বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত কোন আত্মজ্যোতির উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধি যখন কোন বস্তু-বিশেষের আকার গ্রহণ করে, তখনই সেই বস্তুর উপলব্ধি হয়। কিন্তু তৎকালে বুদ্ধির সমানকার অন্য একটী দ্বিতীয় বুদ্ধির উপলব্ধি কখনও হয় না। ঘট এবং আলোক উভয়ই প্রত্যক্ষ।—অবভাস্য ঘট এবং অবভাসক আলোকের স্বতন্ত্রত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ,—যদিও বিচার দ্বারা ঘট হইতে আলোককে পৃথক্ করা যায় না। ঘট এবং আলোকের পরস্পর সাদৃশ্য অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ ঘট হইতে পৃথক্‌রূপে আলোকের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। ঘট এবং আলোকের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভিন্নবস্তুদ্বয়েরই পরস্পর সাদৃশ্য সম্ভব। কিন্তু ঘট এবং আলোকের ভিন্নত্ব সম্বন্ধে যেরূপ, এস্থলে সেরূপ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কোন বস্তু অথবা বুদ্ধির অবভাসকরূপে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জ্যোতি প্রত্যক্ষ, অথবা অনুমানদ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। অতএব এস্থলে বুদ্ধির নিজেরই চিৎস্বরূপাবভাসকত্ব, বা গ্রাহক-চৈতন্য-স্বরূপত্ব স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধি নিজেই নিজের আকারে, এবং ঘটাদি বিষয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান দ্বারা বুদ্ধির অবভাসক, অথচ বুদ্ধি হইতে ব্যতিরিক্ত কোনরূপ জ্যোতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। আবার যদিও দৃষ্টান্ত স্বরূপে পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ঘটাদি অবভাস্য তাহার অবভাসক আলোক হইতে ভিন্ন বস্তু, এবং তাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে বলা যায় যে, ঘটের সহিত আলোকের সাদৃশ্য আছে,—তাহাও কেবল তর্কস্থলেই মাত্র আমরা স্বীকার করিতেছি। বস্তুতঃ সে স্থলেও ঘটাদি অবভাস্য, এবং আলোক - তাহার অবভাসক, ভিন্ন বস্তু নহে। পরমার্থতঃ সেস্থলে প্রতি-মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন একটী আলোক-যুক্ত নূতন ঘট উৎপন্ন হয় (ক্ষণভঙ্গবাদ)। অথবা কেবল মাত্র বিজ্ঞানই আলোকযুক্ত ঘটাদি বাহ্য বিষয়ের আকারে প্রকাশিত হয় (বিজ্ঞান-বাদ) এরূপ স্বীকার করিলে, যেহেতু সমস্তই বিজ্ঞানাত্মকমাত্র হয়, অতএব তাহার কোন বাহ্য দৃষ্টান্ত সম্ভব হয় না। এইরূপে (বৌদ্ধগণ) সেই বিজ্ঞানের গ্রাহ্যাকার এবং গ্রাহকাকার (Object and subject) রূপে মলিনতা কল্পনা করিয়া পুনরায় (সাধনদ্বারা) তাহার বিশুদ্ধি ও কল্পনা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের কাহারো কাহারো মত যে গ্রাহ্য এবং গ্রাহক রূপ হইতে বিনির্মুক্ত হইলে,

সেই বিজ্ঞানই স্বচ্ছীভূত হইয়া ক্ষণিকরূপে অবস্থান করে। কেহ বা সেই স্বচ্ছ বিজ্ঞানেরও নির্ব্বাণ ইচ্ছা করেন। কাহারও কাহারও সেই বিজ্ঞানই সাধনা-দ্বারা গ্রাহ্য-গ্রাহকাংশ-সবিনির্ম্মুক্ত হইলে শূন্যরূপ হয়। মাধ্যমিকেরা বলেন যে, সেই বিজ্ঞানই ঘটাদি বাহ্যবস্তুর সমানকার হয়। বুদ্ধি বিজ্ঞানের অবভাসক, বুদ্ধ্যাদি হইতে ব্যতিরিক্ত, পূর্ব্বোক্ত আত্মা-চৈতন্য-জ্যোতির অস্তিত্ব অস্বীকার দ্বারা বৈদিকমার্গের প্রতিপক্ষ হওয়াই বৌদ্ধদিগের এই সমস্ত কল্পনার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে যাহাদের মতে বাহ্যবস্তুই মাত্র আছে, তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে।"*

(৫) বাহ্যার্থের ব্যতিরিক্ত চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতা বাহ্যবস্তু হইতে ভিন্ন।

বৌদ্ধগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাহ্যবস্তু মাত্রই আছে। তাহা হইতে পৃথক্, বাহ্যবস্তুর কোন গ্রাহক বা জ্ঞাতা নাই, শঙ্কর তাহাদিগকে বলিতেছেন —"তাহা নয়, কারণ ঘটাদি বাহ্যবস্তু নিজে নিজের অনবভাসক অর্থাৎ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। অন্ধকারে অবস্থিত ঘটাদি কখনও আপনাদ্বারা আপনি প্রকাশিত হয় না। সে সকল নিয়তই প্রদীপাদির আলোক-সংযোগ দ্বারা প্রকাশমান দৃষ্ট হয়। ঘট এবং আলোক পরস্পরের সহিত যুক্ত হইলেও তাহাদের পরস্পরের ভিন্নত্ব দৃষ্ট হয়। রজ্জুর সহিত ঘটের পুনঃ পুনঃ সংশ্লেষ-বিশ্লেষের ন্যায়, ঘটের সহিত আলোকের পুনঃপুনঃ সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ দৃষ্টে, তাহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপন্ন হয়। সেই ভেদ দৃষ্টেই বলা হয়, ঘটাদির অবভাসক,—আলোক, ঘট হইতে স্বতন্ত্র। ঘট আপনাদ্বারা আপনি প্রকাশিত হয় না। (তবে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে) যদিও ঘট আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিতে অক্ষম, তথাপি প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশিত করে, ইহা প্রত্যক্ষ, যেহেতু ঘটাদির ন্যায় প্রদীপের দর্শনার্থ লোকে আলোকান্তর গ্রহণ করে না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ করে। (এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছে) তাহা নয়। (আত্মচৈতন্য দ্বারা) প্রকাশ্যত্ব বিষয়ে ঘট এবং প্রদীপের মধ্যে কোন বিশেষ বা পার্থক্য নাই। যদিও প্রদীপ স্বয়ং-প্রকাশ হওয়াতে ঘটাদি অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তথাপি প্রদীপও পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরিক্ত-চৈতন্যাবভাস্যত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করে না। এ সম্বন্ধে প্রদীপও ঘটাদিরই তুল্য। যে হেতু এইরূপই (নিয়ম) অতএব ব্যতিরিক্তচৈতন্যাবভাস্যত্ব অবশ্যম্ভাবী (necessary and universal)। তবে ঘট এবং প্রদীপের মধ্যে এই মাত্র বিশেষ যে, ঘট আত্মচৈতন্যের অবভাস্য হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন প্রদীপাদি আলোকান্তরের অপেক্ষা করে, কিন্তু প্রদীপ সেরূপ আলোকান্তরের অপেক্ষা করে না। অতএব প্রদীপ অন্যাবভাস্য, অর্থাৎ আত্মচৈতন্যাভাস্য হইলেও প্রদীপ আপনাকে আপনি অবভাসিত করে। এজন্য প্রদীপকে স্বতঃঅবভাস্য বলা ন্যায় বটে, কিন্তু ব্যতিরিক্তচৈতন্যাবভাস্যত্ব বিষয়ে ঘট এবং প্রদীপ,—এই উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ নাই। ঘটের চৈতন্যাবভাস্যত্ব যেরূপ, প্রদীপের চৈতন্যাবভাস্যত্বও সম্পূর্ণ সেইরূপ। সচরাচর যে বলা হয়, প্রদীপ আপনাকে এবং ঘটকে, উভয়কে অবভাসিত করে, তাহা বলা ঠিক

* তত্র যেষাং বাহ্যোঽর্থোঽস্তি তান্ প্রত্যুচ্যতে।

নয়। কেন? (প্রদীপ) যখন আপনাকে অবভাসিত না করে, তখন কিরূপ হয়? তখন (গ্রাহক চৈতন্যের অভাবে) প্রদীপের স্বতঃ অবভাস্যত্ব, এবং ঘটের পরতঃঅবভাস্যত্বে কোন বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তখন (প্রদীপ ও ঘটাদির ন্যায়) অবভাস্য মাত্রই থাকে। ঘট এবং প্রদীপ উভয়ের অবভাসক গ্রাহক-চৈতন্য যখন নিকটে থাকে, এবং যখন তাহা নিকটে না থাকে, তাহাতেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রদীপের আপনার সম্বন্ধে আপনার সন্নিধি বা অসন্নিধি হইতে পারে না। গ্রাহক-চৈতন্য সম্বন্ধে যখন প্রদীপাদির স্বতঃঅবভাস্যত্বের, এবং ঘটাদির পরতঃঅবভাস্যত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তখন প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, একথা মিথ্যাই বলা হয়। ব্যতিরিক্ত-চৈতন্যগ্রাহ্যত্ব বিষয়ে ঘটাদির সহিত প্রদীপের কোন পার্থক্য নাই।"

এইরূপে, আমরা দেখিতে পাই, ব্যতিরিক্ত গ্রাহক-চৈতন্যের সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া শঙ্কর বৌদ্ধদিগের 'বাহ্যার্থবাদ' খণ্ডন করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর আরও বিস্তারিতরূপে বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বাহ্যার্থবাদীরা বাহ্যবস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে বাহ্যবস্তুও ক্ষণিক, আকাশস্থ মেঘের ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। তাহার কোন চেতন ভোক্তা বা জীব, অথবা জগতের কোন চৈতন্যময় প্রশাসিতা বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। বাহ্যার্থবাদীরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—(১) সৌত্রান্তিক, তাহাদের মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমান-সিদ্ধ বা পরোক্ষ, এবং (২) বৈভাষিক, তাহাদের মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বা অপরোক্ষ। ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য ২-২-১৮ হইতে ২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না।

(৬) বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব, অর্থাৎ গ্রাহক বা জ্ঞাতা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন।

অনন্তর শঙ্কর বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞান-বাদ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছেন:—"বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, যে বিজ্ঞান আপনিই আপনার গ্রাহ্য বা অবভাস্য (Object) এবং আপনিই আপনার গ্রাহক বা অবভাসক (subject)। প্রদীপের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে গৃহীত হইতে পাবে না। বস্তুতঃ বিজ্ঞানেরও ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব-বাহ্যবস্তুরই তুল্য।" শঙ্কর দেখাইয়াছেন:—"বিজ্ঞান যদি ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্য না হয়, এবং বিজ্ঞান যদি আপনি আপনার গ্রাহ্য, এবং আপনি আপনার গ্রাহক উভয়ই হয়, তবে বিজ্ঞানই দ্বিবিধ হইল:— বাহ্য বিজ্ঞান, এবং গ্রাহক বিজ্ঞান। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে:—বুদ্ধি-বিজ্ঞান কি তবে গ্রাহ্য-বিজ্ঞানেরই গ্রাহ্য (object to the object-intellect), অথবা গ্রাহক-বিজ্ঞানের গ্রাহ্য (object to the subject intellect)? এই সন্দিহ্যমান বিষয়ে অন্যত্র যে ন্যায় অবলম্বিত হয়, তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টের বিপরীত কল্পনা হইতে পারে না, অর্থাৎ বিজ্ঞানও গ্রাহক-বিজ্ঞানেরই গ্রাহ্য, এবং প্রদীপাদি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে যেমন গ্রাহক বা জ্ঞাতা (subject) গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় (object) প্রদীপাদি হইতে ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপই বিজ্ঞানের গ্রাহক বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত হইবে। তাহা হইলেই চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব হেতু,—প্রকাশ-স্বতাক স্বত্বেও, প্রদীপের ন্যায় বিজ্ঞানেরও ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব অনুমান করাই যুক্তি-সঙ্গত। বিজ্ঞানের অনন্য-গ্রাহ্যত্ব, অথবা বিজ্ঞান আপনিই আপনার গ্রাহক (subject), এরূপ

কল্পনা অসঙ্গত। সেই অন্ত বা ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য যাহা বিজ্ঞানেরও গ্রাহক (subject,) তাহাই আত্মা, তাহাই অন্তরস্থ জ্যোতি,—বিজ্ঞান হইতেও অন্তরতম। যদি বল, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয়,—যথা বিজ্ঞানের গ্রাহকান্তর অপেক্ষা, আবার সেই গ্রাহকের গ্রাহকান্তরাপেক্ষা, তাহার আবার গ্রাহকান্তরাপেক্ষা,—এইরূপ গ্রাহকান্তরের অনন্ত শৃঙ্খল,—তাহা নয় *। গ্রাহ্য-বস্তুর পক্ষে গ্রাহক হওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানাদিও গ্রাহ্য বস্তু। অতএব বিজ্ঞানাদির পক্ষেও আপনার সম্বন্ধে আপনার গ্রাহকত্ব অসম্ভব। "বিজ্ঞানের গ্রাহকের বস্তন্তরত্ব অথবা ব্যতিরিক্তত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গ্রাহ্যত্ব অথবা অগ্রাহ্যত্বই ন্যায়তঃ উক্ত একমাত্র লিঙ্গ। অর্থাৎ যাহা যাহা গ্রাহ্য, তাহাই ব্যতিরিক্ত গ্রাহকের গ্রাহ্য,—যেমন ঘটাদি। (Whatever is an object, is an object to a subject other than itself।) ইহাই গ্রাহ্য হইতে গ্রাহকের ব্যতিরিক্তত্ব অনুমানের হেতু। সেই গ্রাহকান্তরের একান্ত গ্রাহকতা, অর্থাৎ সেই গ্রাহকান্তর যে কেবল গ্রাহকই, গ্রাহ্য নয়, অথবা সেই গ্রাহকান্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও দ্বিতীয়ের অভাব হেতু, কখনও কোন অনুমাপক লিঙ্গ সম্ভব হয় না।" অনুমাপক-লিঙ্গের কোন স্থান নাই,—কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা বা গ্রাহক-চৈতন্য স্বয়ং সিদ্ধ চৈতন্য-জ্যোতিস্বরূপ। "অতএব সেইরূপ কোন অনবস্থার স্থান নাই †। আবার যদি বল যে, বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত গ্রাহকত্ব অর্থাৎ বিজ্ঞানের গ্রাহক সেই বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলে, করণান্তরের (অন্য তৎসম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রের) ও অপেক্ষা করে, অতএব করণ সম্বন্ধেও অনবস্থা,—তাহা নয়। কারণ সর্ব্বত্র এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, সেখানেই এক বস্তু দ্বারা অন্য বস্তু গৃহীত হয়, সেখানেই গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয় হইতে ব্যতিরিক্ত করণান্তরও থাকে। এ সম্বন্ধে বৈচিত্র্যই দৃষ্ট হয়। কিরূপ? যথা, ঘট হইতে পৃথক্ আত্ম-চৈতন্যদ্বারা ঘট গৃহীত হইলেও, গ্রাহ্য ঘট এবং গ্রাহক চক্ষুরাদিমান্ পুরুষ হইতে পৃথক্, আলোকাদি করণ বা সাহায্যকারী থাকে। প্রদীপাদির আলোক, ঘটেরও অংশ নয়, চক্ষুরও অংশ নয়। কিন্তু প্রদীপ, ঘটাদির ন্যায় পুরুষের চক্ষু-গ্রাহ্য হইলেও, চক্ষু এবং প্রদীপ উভয় হইতে ব্যতিরিক্ত, বাহ্য আলোকান্তর-স্থানীয় কোন করণান্তরের অপেক্ষা করে না। অতএব করণান্তর সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম প্রমাণ করা যায় না যে, যেখানেই ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্যত্ব থাকিবে, অর্থাৎ গ্রাহ্য হইতে গ্রাহক ভিন্ন হইবে, সেখানেই করণান্তরও থাকিবে। অতএব বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত গ্রাহকের (Subject) গ্রাহ্য (object) হওয়াতে, করণান্তর সম্বন্ধে অনবস্থা, অথবা গ্রাহক সম্বন্ধে অনবস্থা কখনও প্রমাণ করা যায় না। ইহা দ্বারা বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত

* Exactly the same objection has been taken by H Spencer in his article on the Substance of the Soul unknowable, in his Psychology. On this argument he bases his agnosticism

† টীকাকার আনন্দগিরি বলিতেছেন:—"স্ফুটস্ববোধস্ত বিজ্ঞানসাক্ষিণোঽবিষয়ত্বান্নানবস্থা,—স্ফুটস্ববোধ স্বরূপ বিজ্ঞান সাক্ষীর অবিষয়ত্ব হেতু, অনবস্থা দোষ হয় না। The subject is self-conscious or self-known (স্বপ্রকাশ), and not known as an object (বিষয়) by an act of perception.

অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতি সিদ্ধ হইতেছে (জীবা-নন্দ পৃঃ ৭৩৫ আদি।

অনন্তর শঙ্কর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদিগের অন্য রূপ আপত্তির উল্লেখ করিতেছেন:—কিন্তু বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত ঘটনাদি বা প্রদীপাদি কোন বাহ্য বস্তুই নাই (Esse is Percipii)। যে বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত বা স্বতন্ত্রভাবে যে বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই শেষোক্ত বস্তু প্রথমোক্ত বস্তুমাত্রাত্মকই দৃষ্ট হয়। যথা, স্বপ্ন-বিজ্ঞান-গ্রাহ্য ঘট-পটাদি বস্তুর স্বপ্ন-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না, অতএব স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘট-পটাদির স্বপ্ন-বিজ্ঞান-মাত্রতাই জানা যায়। সেইরূপ জাগরিত কালেও জাগ্রদ্বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ রূপে ঘটপ্রদীপাদির উপলব্ধি হয় না, অতএব জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদির ও জাগ্রদ্বিজ্ঞানমাত্রতা হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। অতএব ঘট-প্রদীপাদি ব্যাহ্যবস্তু কিছুই নাই, সকলই বিজ্ঞান মাত্র। সকলই যখন বিজ্ঞান মাত্র হইল,তখন এই যে বলা হয়:—বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্তাবভাস্যত্ব-হেতু বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ তাহার অবভাসক (Subject) অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতি আছে,—ঘটনাদি সম্বন্ধে যেরূপ,—একথা মিথ্যা। কারণ সকলই যখন বিজ্ঞানমাত্র হইতেছে,—তখন গ্রাহ্য হইতে গ্রাহক স্বতন্ত্র, এরূপ অনুমানের ভিত্তি-স্বরূপ দৃষ্টান্তেরই অভাব। এইরূপে প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিয়া, শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন:—"তাহা নয়। যতদূর আমরা সকলে স্বীকার করিয়া থাকি, ততদূর স্বীকার করিতেই হইবে। বাহ্য বস্তু যে আপনিও একান্তই স্বীকার করেন না, তাহা নয়। 'আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিনা' যদি বলেন, তাহা নয়। 'বিজ্ঞান' 'ঘট' 'প্রদীপ' এ সকল শব্দার্থের পৃথক্ত্ব হেতু বাহ্যবস্তু বস্তু-দূর স্বীকার করা বুঝায়, অন্ততঃ ততদূর, বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ঘটনাদি বস্বন্তর আপনাকেও স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন বস্বন্তর যদি আপনি স্বীকার না করেন, তবে 'বিজ্ঞান' 'ঘট' 'পট' এবং প্রকার শব্দ সকল একার্থক হওয়াতে পর্য্যায়-শব্দত্ব (synonyms) প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সাধন এবং সাধ্য বা সাধন-ফল যদি এক এবং বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে সাধ্য এবং সাধনের ভেদোপদেশাত্মক বৌদ্ধাদি শাস্ত্রও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। অথবা সেই শাস্ত্রাদির কর্ত্তা বুদ্ধাদির অজ্ঞানতা প্রতিপন্ন হয়। আর এক কথা এই:—বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্তরূপে বাদী, প্রতিবাদী, বাদ, এবং বাদ-দোষ ইত্যাদির সত্তা স্বীকার করা হয়। যেহেতু বাদী, প্রতিবাদী, প্রতিবাদীর বাদ, এবং বাদ-দোষ,—এ সকলই স্বীয় বিজ্ঞানমাত্র, এরূপ কেহই স্বীকার করে না। কারণ প্রতিবাদী-প্রভৃতির মত খণ্ডন করিতে হয়। কেহ মনে করে না যে নিজের বিজ্ঞানকেই নিজে খণ্ডন করিতে হয়, অথবা আপনাকে কেহ অন্যের আত্মা বা 'আমি' মনে করে না। সেরূপ হইলে সর্ব্বসব্যবহার লোপের সম্ভাবনা হইত। আর প্রতিবাদ্যাদিকে লোকে স্বীয় আত্মা বা 'আমি' বলিয়া উপলব্ধি করে, এরূপও কেহ স্বীকার করে না। বরং প্রতিবাদ্যাদিও ব্যতিরিক্তগ্রাহ্য, অর্থাৎ প্রতিবাদ্যাদি তাহাদের হইতে ভিন্ন গ্রাহকের (subject) গ্রাহ্য (object), এরূপই সকলে স্বীকার করে। অতএব প্রতিবাদ্যাদির ন্যায়, জাগ্রদ্বিষয়ত্ব (objectivity) হেতু, জাগ্রদ্বস্তু সমস্তই ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্য। দৃষ্টান্তও স্থূলত, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সন্তানাদি যেমন পর পর ভিন্ন, অথবা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-বিজ্ঞান যেমন পরস্পর ভিন্ন।

ইহাতেই দেখা যায়, বিজ্ঞানবাদী ও বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত অন্তরস্থ আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতির সত্তা স্বীকার করিতে পারেন। স্বপ্নে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভাব, অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত নয়, অতএব জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুও বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত নয়, এরূপ যদি বল, তাহা নয়। স্বপ্নে বিজ্ঞান-ব্যতিরেকের, অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ বাহ্য বস্তুর অভাব হইলেও জাগ্রৎকালে বিজ্ঞান ব্যতিরেকের, অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ বাহ্যবস্তুর সদ্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদ্দ্বারাই সেই বাহ্য বস্তু যে বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, তাহা সিদ্ধ হয়।" "আপনিও স্বপ্নগত ঘটাদি বিজ্ঞানের ভূতভাবত্ব, অর্থাৎ যাহা জাগ্রৎকালে আছে বলিয়া জানা গিয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, স্বীকার করেন। তাহা স্বীকার করিয়াও, জাগ্রদ্বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্ ঘটনাদির অভাব বলিতেছেন"। অনন্তর শঙ্কর অতি সংক্ষেপে শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন:—"আবার বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটাদি ভাবাত্মক হউক, আর অভাবাত্মক বা শূন্যাত্মক হউক, ঘটাদিবিজ্ঞান যে ভাবাত্মক, তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা বারণ করা যায় না, যে হেতু তাহা বারণ করার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এতদ্দ্বারা সর্ব্বশূন্যতা মতের উত্তর দেওয়া হইল। এই সঙ্গে গ্রাহক আত্মা যে বুদ্ধিবিজ্ঞানের গ্রাহ্য, অথবা অহঙ্কার-স্বরূপমাত্র, মীমাংসকদিগের এই-মতও যে খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতেছেন:—"ইহাতে আমি" এই অনুভূতি (বা অহঙ্কারদ্বারাই) গ্রাহকাত্মার গ্রাহ্যতা (objectivity) সিদ্ধ হয়, আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসকদিগের এই মতেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল,—যে হেতু গ্রাহ্য এবং গ্রাহক (object and subject) এই উভয়ের একত্ব নিরস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ২-২-২৭ হইতে ৩২ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর আরও বিস্তারিতরূপে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

(৭) বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিয়াছেন:—"আর যে বলা হয়, আলোক-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘট (প্রতিক্ষণে) উৎপন্ন হয়, এ কথা অসৎ। কারণ ক্ষণান্তরে ও 'এই ঘটই সেই পূর্ব্বের ঘট' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition of identity) জন্মে। যদি বল যে এই প্রত্যভিজ্ঞান সাদৃশ্যজনিত (similarity) যেমন ছিন্ন কেশ-নখাদির পুনরুত্থান হইলে, মনে হইয়া থাকে,—তাহা নয়। আর কৃত্ত-কেশ-নখের পুনরুত্থানও ক্ষণিক নয়। অতএব কৃত্ত-কেশ-নখাদির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ হয়। আর কৃত্ত-পুনরুত্থান-কেশ-নখাদির একত্ব জাতিগত একত্ব। কৃত্ত-কেশ নখাদি পুনরুত্থিত হইলে, জাতিগত (generic) একত্ব হেতু, সেই পুনরুত্থিত কেশ-নখাদিতে কেশ-নখত্ব প্রত্যয় হয়। এজন্য সেই প্রত্যয় ভ্রান্ত নয়। দৃশ্যমান কৃত্তোত্থিত কেশ-নখাদিতে ব্যক্তি-নিমিত্ত (individuality), অর্থাৎ এই পুনরুত্থিত কেশ-নখই সেই কেশনখ যাহা পূর্ব্বে কৃত্ত বা কাটা হইয়াছিল, এরূপ প্রত্যয় হয় না। কেশ-নখ ছেদনের দীর্ঘকাল পরে কোন ব্যক্তির দর্শন লাভ হইলে, এবং পুনরুত্থিত বালাদি পূর্ব্বের তুল-পরিমাণ দীর্ঘ হইলে, তাহাতে তৎকালীন বালাদি-তুল্যত্ব (similarity) প্রত্যয়ও হয় বটে. কিন্তু এই বালাদিই পূর্ব্বের বালাদি

এরূপ (Identity) প্রত্যয় কখনও হয় না। ঘটাদি সম্বন্ধে 'এই ঘটই পূর্ব্বের ঘট' (Identity), এরূপ প্রত্যয় হয়। অতএব কৃত্তবালাদির দৃষ্টান্ত ঘটাদির তুল্য নয়, কারণ ঘটাদি-বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় যে "সেই পূর্ব্বের ঘটই এই ঘট (identity)। এইরূপে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হেতু ঘটাদির ক্ষণিকত্বের, এবং ক্ষণভেদে ঘটাদির ভিন্নত্বের কল্পনা যুক্তি-সঙ্গত নয়। যেহেতু অনুমাপক লিঙ্গপরামর্শে ভ্রম হইলে, অনুমানে ভ্রম হইতে পারে, অতএব প্রত্যক্ষদ্বারা অবাধিত বিষয়েই অনুমান করিতে হয়। আর ক্ষণভঙ্গবাদীর মতেও "এইঘটই সেইঘট" এরূপ তাদাত্ম্যের (identity) উপলব্ধি, সাদৃশ্য-প্রত্যয়-জন্য (similarity) ভ্রম হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে, সাদৃশ্য-প্রত্যয়ও অসম্ভব। যখন কেহ এক বস্তু দেখিয়া পরে অন্য বস্তু দর্শন করে, তখনই তাহার সাদৃশ্য-প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু ক্ষণিকবাদীর মতে একই বস্তুদর্শী বস্ত্বন্তর-দর্শনের জন্য ক্ষণান্তর পর্য্যন্ত অবস্থান করেনা। আর বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করাতে একবার মাত্র বস্তু-দর্শনেই সেই বিজ্ঞানেরও ক্ষয় হওয়া সঙ্গত। সাদৃশ্য-প্রত্যয় বলিলে 'তাহার সহিত ইহা সদৃশ' এরূপ বুঝায়। "তেনেতি"— 'তাহার সহিত' বলাতে পূর্ব্বদৃষ্টের স্মরণ বুঝায়। 'ইদমিতি' 'ইহা' বলাতে বর্ত্তমান প্রত্যয় বুঝায়। 'তেনেতি' 'তাহার সহিত' বলাতে পূর্ব্বদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া, যাবৎ 'ইদং' 'ইহা' অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্ষণকাল পর্য্যন্ত, সেই স্মৃতির অবস্থিতি বুঝায়, তদ্দ্বারাও ক্ষণবাদের খণ্ডন হইতেছে। অথবা 'তেন' বলিতে উপক্ষীণ স্মার্ত্ত প্রত্যয়, আর 'ইদম্' বলিতে অক্ষ বার্ত্তমানিক প্রত্যয় বুঝায়। 'ক্ষীয়তে'— 'ক্ষয়' হয়। যদি বল পূর্ব্বদৃষ্ট প্রত্যয়ের ক্ষয় হয়, তবে 'তাহার সহিত ইহা সদৃশ' এরূপ সাদৃশ্য প্রত্যয় হইতে পারে না। কারণ একাধিক বস্তু-দর্শন হইলেও পূর্ব্বদৃষ্ট 'একের' ক্ষয়জন্য অভাব হেতু—'তাহার সহিত ইহা সদৃশ'—এরূপ সাদৃশ্য প্রত্যয় অসম্ভব। তাহার উল্লেখও করা অসম্ভব। দ্রষ্টব্যের দর্শন মাত্রই যদি দৃষ্ট-বিষয়ক বিজ্ঞানের উপক্ষয় হইল, তবে 'ইহা দেখিয়াছি' 'উহা দেখিয়াছিলাম'—এরূপ উল্লেখ অসম্ভব,—যেহেতু ক্ষণবাদীর মতে যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি উল্লেখের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করে না। অতএব ক্ষণবাদ খণ্ডন ব্যবস্থিত রহিল। যে ব্যক্তি 'সেইটী' এবং 'এইটী' উভয়টী দেখে নাই, তাহার পক্ষে তাহাদের সাদৃশ্য প্রত্যয়, এবং তাহার উল্লেখ, জাত্যন্ধের রূপ-বিশেষের সাদৃশ্য-প্রত্যয়, এবং তাহার উল্লেখের ন্যায় উপহাস-যোগ্য হয়। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধাদির শাস্ত্র প্রণয়নাদি কার্য্য সকলই তবে অন্ধপরম্পরার ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। তাহা কাঁহারও অভিপ্রেত নয়। আবার ক্ষণবাদ স্বীকার করাতে অকৃতের অভ্যাগম, এবং কৃতের বিনাশরূপ দোষদ্বয় আরও প্রসিদ্ধতর। যদি বল যে 'পূর্ব্ব' এবং 'পর' একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্রত্যয় জন্মে, এবং সেই কারণেই 'তাহার সহিত ইহা 'সদৃশ'—ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বোল্লেখ সম্ভব হয়। তাহা হইতে পারে না। তাহার কারণ বর্ত্তমান প্রত্যয়ের এবং অতীত প্রত্যয়ের ভিন্নকালত্ব। ভিন্নকালত্ব হেতু বর্ত্তমান প্রত্যয় এক শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয়, এবং অতীত প্রত্যয় অপর শৃঙ্খলাবয়ব-স্থানীয়। এই উভয় প্রত্যয় পরস্পর ভিন্ন কাল-সম্বন্ধী। যদি বল, পূর্ব্ব-কথিত শৃঙ্খলা-প্রত্যয় উভয় প্রত্যয়ের বিষয়কে স্পর্শ

করে, তবে বিজ্ঞানের পূর্ব্ব এবং পর ক্ষণদ্বয় ব্যাপীত্ব হেতু, আবার ক্ষণবাদের খণ্ডন হইতেছে। ক্ষণবাদ মতে 'আমার' 'তোমার' ইত্যাদি বিশেষত্ব অসম্ভব হওয়াতে সর্ব্ব সদ্ব্যবহার লোপ হওয়াই সঙ্গত। আর যদি সকলই বুদ্ধি-বিজ্ঞানের (intellect) স্ব-সম্বেদ্য-বিজ্ঞান মাত্র হয়, এবং বুদ্ধি বিজ্ঞান যদি স্বচ্ছ জ্ঞানের প্রকাশ মাত্র স্বভাব স্বীকার করা যায়, এবং যদি বুদ্ধি বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহারই দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে কোন আত্মা না থাকে, তবে যাহা ক্ষণিক, দুঃখাত্মক, অথবা শূন্যমাত্র, তাহার আত্মত্বাদি নানাপ্রকার কল্পনা অসঙ্গত। স্বচ্ছ ৰভাস-স্বভাবত্ব স্বীকার করাতে দাড়িমাদির ন্যায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ অনেকাংশবত্ত্বও হইতে পারে না। আর যাহা ক্ষণিক বা যাহা দুঃখাত্মাত্মক, তাহা যদি বিজ্ঞানাংশই হইল, তবে অনুভূয়মানত্বহেতু তাহাকে ব্যতিরিক্ত-আত্মচৈতন্যের বিষয় বলাই সঙ্গত। আর যদি বল, বিজ্ঞান অনিত্য এবং দুঃখাত্মাত্মক, তাহা হইলে দুঃখাদির বিয়োগ দ্বারা বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনাও অসঙ্গত। সংযোগী-মলের বিয়োগ দ্বারাই বিশুদ্ধি সিদ্ধ হয়—যেমন আদর্শ প্রভৃতির। কিন্তু স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত কাহারও বিযোগ দৃষ্ট হয় না। যেমন স্বাভাবিক প্রকাশ এবং উষ্ণতার সহিত অগ্নির বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। যদিও দ্রব্যান্তরযোগে রক্তত্বাদি পুষ্প-গুণের বিয়োজন দৃষ্ট হয়, সেস্থলেও সংযোগ-পূর্ব্বত্বই অনুমান করিত হয়, যেহেতু বীজভাব ধারণ উপলক্ষেই পুষ্প-ফলাদির মধ্যে গুণান্তরোৎপত্তি দৃষ্ট হয়। অতএব বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনা অসঙ্গত। বিষয়-বিষয়ী-ভেদ-রূপ ভ্রমই বিজ্ঞানের মল,—যাহা কল্পনা করা হয়,—বস্তুন্তর সংসর্গের অভাবহেতু সেরূপ কল্পনাও অসঙ্গত। অবিদ্যমানের (অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বিষয়-বিষয়ী-ভাবের) সহিত বিদ্যমান স্বচ্ছ-স্বভাব বিজ্ঞানের সংসর্গ হয় না। বস্তন্তর সংসর্গই যখন অবিদ্যমান, তখন যাহা যাহার ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা তাহারই স্বভাব। অতএব তাহা হইতে তাহার বিয়োজন হইতে পারে না, যেমন অগ্নি এবং উষ্ণত্ব, বা সূর্য্য এবং তাহার প্রভা। অতএব বস্তন্তর-সংসর্গ দ্বারা বিজ্ঞানের মলিনত্ব, এবং তাহার বিয়োগ দ্বারা তাহার বিশুদ্ধির কল্পনা অন্ধ-পরম্পরার ন্যায় প্রমাণশূন্য,—ইহাই দেখা যাইতেছে। আর যে সেই বিজ্ঞানের নির্ব্বাণে পুরুষার্থ কল্পনা করা হয়,—সেস্থলেও ফলের কোন আশ্রয় (ভোক্তা) কল্পনার স্থান নাই। কণ্টক হইতে যে বিদ্ধ, তাহার পক্ষেই কণ্টক-বেধ-জনিত দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ফল-লাভ সম্ভব। (ফলীর বা ভোক্তার অভাব অথচ ফল-লাভ —তাহা হয় না)। কণ্টকবিদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের পক্ষে সেই দুঃখ-নিবৃত্তি-ফলের আশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না। সেইরূপ সর্ব্ব-নির্ব্বাণ হইলেও যদি ফলাশ্রয় বা ভোক্তা কেহ না থাকে, তবে তাহাতে পুরুষার্থ কল্পনা নিরর্থক। যে পুরুষশব্দ-বাচ্য সত্ত্ব বা আত্মা, বা বিজ্ঞানের অর্থই 'পুরুষার্থ' বলিয়া কল্পিত হইতেছে, সেই পুরুষের নির্ব্বাণ হইলে,—কাহার 'অর্থ' পুরুষার্থ হইবে? অপরদিকে যাহার মতে অনেকার্থদর্শী, বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, তাহার পক্ষে দৃষ্টের স্মরণ, দুঃখাদির সংযোগ এবং বিয়োগ,—সকলই সম্ভব,—অন্য সংসর্গ-জনিত তাহার কলুষতা, এবং তদ্বিয়োগ-জনিত তাহার বিশুদ্ধি শূন্যবাদী-মত পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার প্রমাণ দ্বারাই অপ্রমাণিত, অতএব তাহার নিরাকরণের জন্য পৃথক্‌ভাবে যত্ন করা গেল না। বৃহদারণ্যক—পৃঃ ৭৪৬ জীবানন্দ॥

(৮) শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রভাব।

পাঠক দেখিতেছেন, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উক্ত উপনিষদ্ভাষ্যে বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ, এবং শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (২--২—১৮ হইতে ৩২) তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের এ সকল মতের আরও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। স্থানান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন, শঙ্করের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব কিরূপ দেশময় বিস্তৃত ছিল। শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন "বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোক আকুলীক্রিয়তে" "বৈনাশিক (বৌদ্ধগণ) লোকসকলকে অস্থির করিয়া তুলিতেছেন" (২—২—২৬)। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও শঙ্কর বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মত খণ্ডনের জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এবং শূন্যবাদ (Nihilism) যেন অদ্যাপি ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। "সংসার মিথ্যা," "সংসার স্বপ্নবৎ" ইত্যাদি বৌদ্ধভাব অদ্যাপি আপামর আমাদিগের সকলেরই অস্থি-মজ্জাগত। এমন কি, সংসারের অনিত্যতা অসারতার চিন্তায় নিরন্তর সশঙ্কিত থাকাতে, পৃথিবীর অপরাপর জাতি সকলের ন্যায়, অথবা আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ন্যায়, অধুনাতন ভারতবাসী যেন প্রাণমন ঢালিয়া "অজরামরবৎ" জ্ঞান এবং ধনের বিস্তার দ্বারা দেশের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে 'সরিষাদ্বারা ভূত ছাড়াইবে, সেই সরিষার ভিতরেই ভূত'। যে 'বিজ্ঞানবাদ' খণ্ডন করিয়া শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞানবাদের দোষগুলি সমস্তই যেন শঙ্করের মায়াবাদেও সংক্রামিত হইয়াছে। মায়াবাদ ভারতের প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের ভিত্তিস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, যদিও অনেকে চৈতন্যদেবকে শঙ্করের বিরোধী কল্পনা করেন, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব শঙ্করের প্রবর্ত্তিত শৃঙ্গগিরি মঠের বিখ্যাত ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্মের দীক্ষা লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ আপনাকে "মায়াবাদী সন্ন্যাসী" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। শঙ্করের পূর্ব্বে মায়াবাদ নামে কোন দার্শনিক মত ছিল না। মায়াবাদ শঙ্করাচার্য্যেরই প্রতিষ্ঠিত, এবং শঙ্করেরই নামে পরিচিত। আমরা নিম্নে বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত পঞ্চদশীর উক্তির সহিত শঙ্করের নিজের উক্তির তুলনা করিয়া দেখাইব যে, শঙ্কর বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদে, ক্ষণভঙ্গবাদে, এবং শূন্যবাদে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শঙ্করের নিজের ক্রটীতে না হউক, অন্ততঃ তাঁহার সাম্প্রদায়িকদিগের ক্রটীতে, সেই সমস্ত দোষই তাঁহার মায়াবাদকেও কলুষিত করিয়াছে।

একদিকে শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :—"অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি—বৈনাশিকদিগের এই [1] মত অসঙ্গত"*। ২—২—২৭॥ অপরদিকে পঞ্চদশী বলিতেছেন :—"প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং"। ৬—২৫৫। "দ্বৈত পূর্ব্বে অভাব মাত্রই ছিল"। ইহাতে পঞ্চদশীর মায়াবাদে যেন আমরা বৌদ্ধ শূন্য-

* অনুপপন্নোয়ম-ভাবাদ্ভাবোৎ-পত্ত্যভ্যুপগমঃ-২-২-২৭।

[1] Ex nihilo nihil fit

বাদেরই আভাস পাইতেছি। একদিকে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন:—"যাহা নিশ্চিত বলিয়া অনুভূত হয়, যথা "এই বস্তু এইরূপই" তাহা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। তাহার বিপরীত যাহা কিছু বলা হয়, তাহাতে বক্তার বহুপ্রলাপিত্ব মাত্রই প্রকাশ পায়।" ২—২—২৫। কিন্তু অপর দিকে পঞ্চদশী যেন প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যের অপলাপ করিয়া বলিতেছেন, "ক ধানা কুত্র বা বৃক্ষস্তন্মায়েতি নিশ্চিনু" ৬—২৫৫॥ "কোথায় বা বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মায়া বলিয়া জানিবে।" "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চসাধকঃ"—উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বদ্ধ কেহ নাই, সাধক কেহ নাই। ৬—২৩৫। বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন:—"যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরপটলং" (স-দ-সং)। পঞ্চদশীও যেন বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদের অনুকরণ করিয়া বলিতেছেন:—"মেঘবৎ বর্ত্ততে মায়া মেঘস্থিত-তুষারবৎ" ৬—১৫৬॥ শুধু পঞ্চদশী কেন, শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা বৌদ্ধ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের আভাস পাইতেছি। শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে উপদেশ করিতেছেন:—"আলোকরশ্মি সম্বন্ধে 'এই সেই আলোকরশ্মি', অথবা স্রোতজল সম্বন্ধে 'এই সেই জল', ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাবাক্য (Recognition of identity) যেমন সাদৃশ্যজনিত ভ্রমমাত্র, অবিবেকীদিগের 'এই সেই মানুষ' ইত্যাদি বাক্য এবং প্রত্যভিজ্ঞাও সেইরূপ মিথ্যা"* ১১-১২-৪৪॥ চৈতন্যদেবের মতে ব্যাসের স্বকৃত এই ভাগবতই আবার ব্যাস-কৃত বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। "সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত"। "সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া। বিবর্ত্তবাদ স্থাপি ব্যাসে ভ্রান্ত কহিয়া ইত্যাদি। চৈতন্য চরিতামৃত-মধ্য-২৫-৫০,৪৯॥ যাহা হউক, শঙ্করকে পরিণামবাদীই বল, আর বিবর্ত্তবাদীই বল, তিনি নিজে এইরূপে আপনার মত ব্যক্ত করিতেছেন:—"বাহ্যবস্তুর অভাব হইতে পারে না, কারণ তাহার উপলব্ধি হয়। যখনই যে প্রত্যয় জন্মে, সেই সঙ্গেই স্তম্ভ, প্রাচীর, ঘট, পট, ইত্যাদি বাহ্যবস্তুরও উপলব্ধি হয়। যাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহার অভাব-কল্পনা সঙ্গত নয়,—যেমন কোন ব্যক্তি আহার করিতে করিতে, এবং সেই আহার-জনিত তৃপ্তি স্বয়ং অনুভব করিতে করিতে কখনও বলিতে পারে না যে, আমি আহার করি না, অথবা আহারজনিত তৃপ্তি অনুভব করি না। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষহেতু যে ব্যক্তি স্বয়ং বাহ্যবস্তু উপলব্ধি করিতেছে, সেই ব্যক্তি যদি বলে 'আমি বাহ্যবস্তু উপলব্ধি করি না' অথবা 'বাহ্যবস্তু নাই', তাহার বাক্য কিরূপে গ্রহণ-যোগ্য হইবে? সূত্র-ভাষ্য—২—২—২৮॥ আবার শঙ্করের মত যে জাগ্রৎ প্রত্যয়ের (Percepts) সহিত স্বপ্নাদি অথবা মায়াদি প্রত্যয়ের তুলনা হইতে পারে না। শঙ্কর বলিতেছেন:—"স্বপ্ন এবং জাগরিতের ধর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন। বিভিন্ন-ধর্ম্মতা কিরূপ? বাধ এবং অবাধ, আমরা বলিতেছি। প্রবুদ্ধ হইলে পর স্বপ্নোপলব্ধ বস্তু বাধিত হয়। মায়াদিজনিত প্রত্যয়ও যথাসম্ভব সেইরূপই বাধিত হয়। কিন্তু স্তম্ভাদি যে সকল বস্তুর জাগ্রৎ কালে উপলব্ধি হয়, সে সকল কোন অবস্থাতেই বাধিত হয় না (পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন শঙ্কর কি

* "সোঽয়ং দীপোঽর্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলং। সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষাঽ"। ভাগবৎ.১১—২২—৪৪।

অর্থে মায়াবাদী)। আর স্বপ্নদর্শন স্মৃতিমাত্র, কিন্তু জাগ্রদ্দর্শন উপলব্ধি-স্বরূপ" ইত্যাদি। সূত্রভাষ্য ২—২—২৯॥ বেইন (Bain), স্পেন্সার (Spencer)ও বোধ হয় স্বপ্নকে 'স্মৃতিমাত্র' বলা ভিন্ন অধিক কিছু বলিয়া জাগৎ-প্রত্যয় হইতে স্বপ্ন-প্রত্যয়ের বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পঞ্চদশী সংসারকে "অসৎ" বা অভাবাত্মক, এবং "স্বপ্নবৎ"ই বলিতেছেন :—"যদসত্তাসমানস্ত-মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ"—'যাহা অসৎ অথচ প্রকাশিত হয়, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট গজাদির ন্যায় মিথ্যা'।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

গবর্ণমেণ্ট-পদের অনুসন্ধান-সমিতি।

অনেক দিন হইতে আমরা নিজে নিজে আলোচনা করিয়াছি, এবং সেই প্রশ্ন আবার সাধারণ চাকুরী-সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরেজ শ্রেষ্ঠ কি না? এক্ষণে ঐ বিষয়ে নানা বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ-পত্র-পাঠকগণ সময়েসময়ে উত্তেজিত হইয়া এবিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলন-সময়ে আমরা সময়ে সময়ে আমাদেশ বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিতাম, এক্ষণে ইংরেজের সর্ব্বতোমুখীন বুদ্ধি কোথায়? তাঁহারা পদে পদে ভ্রম করিতেছেন, অথচ পূর্ব্বে দেখিতাম, প্রত্যেক কার্য্যেই তাহারা ঠিক সময়োপযোগী quite equal to the occasion ছিলেন, আর স্বদেশীর সময়ে তাহাদের ভ্রমে গবর্ণমেণ্ট কত দুর্নামগ্রস্ত হইলেন এবং সাধারণের কত ক্ষতি হইল। এবিষয় Mr. J. N. Gupta, P. S. Commissionএর নিকট যে অতি সুযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই সকলে অবগত আছেন। আমি এবিষয় এক সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও বলিবার সময় আইসে নাই। যেখানে যেখানে বড় বড় জেলায় উপর ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন, সেখানেই একটা না একটা বিষম কেলেঙ্কারী হইয়াছিল। বরিশাল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে যেরূপ গোলযোগ হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতে আর কোথাও এরূপ গোলযোগ হয় নাই, তখন তথায় মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব ইংরেজ। অথচ পাবনা কনফারেন্সে কোন গোল হয় নাই, তথায় তখন মাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী। ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেটগণের তখন দুইটী অস্ত্র ছিল, শাসন ও ভেদ-নীতি। তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের ভিতর ভেদনীতি উপস্থিত করিলেন, বুঝিলেন না, Everyhouse divided against itself, shall not stand ফলে তাই হইল, কুমিল্লার অরাজকতা ও নরহত্যা, জামালপুরে ভীষণ অরাজকতা মেদিনীপুরের অশেষ কেলেঙ্কারী, তাহা সংবাদ-পত্র-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। জামালপুর যেমন মুসলমান-প্রধান, বগুড়াও তদ্রূপ। জামালপুরে শতকরা ১৪ জন হিন্দু, বগুড়ায় শতকরা ১৫ জন হিন্দু। যখন জামালপুর ক্ষেপিয়া উঠিল, তখন ঢাকার নবাবের অনুচরগণ বগুড়ার গ্রামে গ্রামে অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল, দুই একটা খণ্ড প্রলয়েরও উদ্যোগ হইয়াছিল। তখন মিঃ জে, এন, গুপ্ত বগুড়ায় মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ভীত নাগরিকগণকে আশ্বস্ত করিয়া কি কৌশলে তিনি জেলাকে স্থির রাখিলেন, ভাবিলে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। তিনি ভেদনীতি

ছাড়িয়া হিন্দু মুসলমানকে একত্রিত করিয়া পরস্পরের সৌহার্দ্দবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিলেন। একবার কতকগুলি মুসলমান এক হিন্দুর ভবন আক্রমণ করিল। মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের নেতৃগণকে আহ্বান করিয়া সালিসী বিচারে ফেলিতে চাহিলেন, কিন্তু স্বজাতির পক্ষপাতী মুসলমানগণ mobকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, ও কোন মীমাংসা করিলেন না, দাঙ্গাকারীগণ হাজতে গেল। সুক্ষানুসূক্ষ্ম বিচারের ফল কত কালে হাইকোর্টে কত ব্যয়ে মীমাংসা হইত, কে জানে? কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, তোমরা আপোষে মীমাংসা কর, এই বলিয়া তাহাদিগকে হাজত হইতে মুক্তি দিলেন। টাকা হইলে মীমাংসা হইত। যাঁহারা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত নড়িবেন, ও তজ্জন্য চাঁদা দিবেন, কথা ছিল, তাঁহারা অগাধ নিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন, হতভাগ্য পরপরামর্শ-চালিতগণ তখন দেখিল, যেমন মোক্তার বলিযাছেন, "বাবা, একটু কষ্ট করে ফাঁসি কাষ্ঠে হাঁটিয়া উঠ, পিপীলিকার দংশন মাত্র বোধ হইবে, আপীলে নিশ্চয় খালাস করিব", তদ্রূপ, তাঁহারা কতকগুলি লোককে জেলে রাখিয়া অগাধ নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, চাঁদা কোথায় গেল, কে জানে? কিন্তু প্রায় ২০টী পরিবার উপায়হীন হইয়া ঘুরিতে লাগিল। আমি একদিন তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, তাহারা টাকা পাইলে আপোষ করে, কিন্তু কোথায় টাকা? তখন আমি বলিলাম, আমরাই টাকা আদায় করিয়া দিব। এই বলিয়া আমি হিন্দু বন্ধুগণের নিকট প্রস্তাব করিলাম, তাঁহাদের অনেকে চাঁদা দিতে চাহিলেন, তখন বার-লাইব্রেরীর সম্পাদক মুসলমান উকীলগণকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা অত্যাচারিত গৃহস্থ হিন্দু ভদ্রলোকটীকেও আপোষ করিতে অনুরোধ করিলাম, এবং সহজেই মীমাংসা হইয়া গেল। মুসলমানগণ দেখিল যে, তাহাদের নেতাগণ তাহাদিগকে উত্তেজনা করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, তাহাদের বিপদ সময়ে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন নাই, আর হিন্দুরাই টাকা দিয়া পরামর্শ দিয়া তাহাদের উদ্ধার করিল। তখন তাহারা প্রকৃত বন্ধু, বুঝিতে পারিল। আর তাহারা হুজুকে মাতিল না। বগুড়ার মুসলমান প্রায়ই অতি শান্তপ্রকৃতি, ও হিন্দু বংশোদ্ভব, এই ঘটনার পরে আর দুই একটী সামান্য গোলমালে ম্যাজেষ্ট্রেটের কৌশল দ্বারা সকল গোলযোগ মীমাংসিত হইল। যদি এসময়ে একজন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট এই হুজুকে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহার ভেদনীতিপূর্ণ মস্তিষ্ক তখন উত্তেজিত হইয়া চা-কটাহে ঝটিকা উত্থিত করিয়া দিয়া জামালপুর ও কুমিল্লার ঘটনা অনুষ্ঠান করিত। যেমনি ঢাকার নবাব বাহাদুর কুমিল্লায় গেলে গোলযোগ হইয়াছিল, বগুড়ায় তেমনি আর এক খাঁ বাহাদুর আসিবার কথা শুনিয়া নাগরিকগণ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহাদের ভয় জানাইল, তিনি তাহার আগমন নিষেধ করিয়া দিলেন। তৎপরে দুই একটী প্রতিমা ভঙ্গ ও শিলা মূর্ত্তি জলে নিক্ষেপ প্রভৃতি কাণ্ড হয়, দূরদর্শী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন মুসলমান ডেপুটী দ্বারা সালিসী মীমাংসায় সে সকল গোলযোগ নিবারণ করেন। সেই সময়ে বগুড়া ও অন্যান্য জেলার অবস্থা তুলনায় আমরা মনে করিলাম, আমরা রাম রাজ্যে আছি?

আমি সে সময়ে রোগী দেখিতে পাইবান্ধা মহকুমায় গিয়াছিলাম, শুনিলাম, জামালপুরের

অত্যাচারিত অবশিষ্ট হিন্দুগণ যমুনা পার হইয়া আসিতে লাগিল, সবডিভিসন্যাল হিন্দু অফিসর বিজ্ঞাপন দিলেন, অত্যাচারিত লোকদের জন্য কোনরূপ যত্নের ত্রুটী না হয়। তজ্জন্য পুলিসকেও আদেশ দিলেন, এবং মুসলমান mobকে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বগুড়া ও পাবনা উভয় স্থানেই মুসলমান-প্রধান, তথায় কোন গোলযোগ হইলনা, কারণ উভয় স্থানেই তখন দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট। আর সিরাজগঞ্জে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সিরাজগঞ্জে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছিল। যদি nothing succeeds like success কথাটী ঠিক হয়,তবে আমার বোধ হয়, দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ক্ষমতা ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দেখাইতে পারেন নাই। আমি একটী ডেপুটী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বকার ইংরাজের রাজবুদ্ধি এক্ষণে কোথায় গেল? তিনি বলিলেন, পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ডেপুটীগণের বুদ্ধিতে চালিত হইতেন, এক্ষণে আর হিন্দু ডিপুটীগণকে বিশ্বাস করেন না, এই জন্যই বর্ত্তমান দুর্গতি দেখিতেছ। সুতরাং শাসনযন্ত্র পূর্ব্বেই দেশীয়দিগের দ্বারা চালিত হইত, তাই কোন গোলযোগ হইত না। যখন যশোহর জেলায় হিন্দু মুসলমান বিবাদে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে শাসন কার্য্যের অযোগ্য মনে করিয়া ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট আনার কথা হইল, তখন কেহ যদি লাট সভায় প্রশ্ন করিতেন যে, প্রকৃতই কি স্বদেশী গোলযোগের সময় দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ শাসন ক্ষমতার অভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ভাল হইত। অন্ততঃ সংবাদ পত্রেও এবিষয় আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমার বিশ্বাস যে, স্বদেশী-গোলযোগ-সময়ে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ভিন্ন কোন কর্ম্মচারী বিচক্ষণতা দেখাইতে পারেন নাই। এ কথা ধ্রুব সত্য। ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর আমি একটী ক্ষুদ্র জেলার শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। অধিকাংশ সময়েই কোন না কোনরূপে রাজপুরুষগণের সহিত মিশিয়াছি। অনেক দেশীয় ও ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিয়াছি, কখনও এমন দেখি নাই যে, দেশীয় বলিয়া ইহার দ্বারা কোন কোন কার্য্য বিঘ্ন হইয়াছে। Testro, Livesay, Jeffries, Sharp, বড়ুয়া, Waller, Lee, নন্দকৃষ্ণ, Lyon, বি, সি, সৈন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, Carie, রমেন্দ্রকৃষ্ণ, জে, এন, গুপ্ত, এস, সি, মুখার্জ্জি প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে দেখিয়াছি। আমার কখনও মনে হয় নাই যে, native কি ইউরোপীয় বলিয়া কোন কার্য্যের তারতম্য হইয়াছে। ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে ও বুদ্ধিমান,বিদ্বান অনেক ছিলেন,দেশীয়গণের মধ্যে ও ছিলেন। Lee, Lyon প্রভৃতি তৎপরে অনেক উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে সমস্ত দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্য করিয়াছেন, উমেশ বটব্যালের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান চিন্তাশীল আর্য্য-ভাবাপন্ন মুরুব্বি রকমের লোক আর দেখ যায় নাই। সকলেই মনে করিত, তাঁহার নিকট দুঃখের প্রকৃত শান্তি পাইব। তিনি Statutory Civillian, বি, সি, সেন, জে, এন গুপ্ত বিদ্যাবুদ্ধি উপযুক্ততায় কোন ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কম নহেন। এইরূপে কেহ এক বিষয়ে, কেহ অন্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। স্বদেশী-আন্দোলন-সময়ে জে, এন, গুপ্ত ও এস, সি, মুখার্জ্জি যেরূপে জেলা রক্ষা করিয়াছেন, বোধ হয়, কোন ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ম্যাজিষ্ট্রেটকে সকলেই ভয় করে, যদি তাঁহারা কোন

কোন বিশেষ দলকে আপনার করিয়া লইয়া অপরকে অসম্মানিত করেন, সেখানেই শান্তি ভঙ্গ হয়। সুখের বিষয়, দেশীয় বিশেষতঃ হিন্দু ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কোন সম্প্রদায়কেই তুচ্ছ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের সময়ে কোন অশান্তি হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমানের বিশেষ বিশেষ সংস্কার, তাহাদের ভালবাসা মন্দবাসা, রীতিনীতি, দেশীয়গণ বিশেষ জানেন, তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপকে তলপ দেননা, এজন্যই বিপদ আপদ সময়ে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে সুবিচার করিতে পারেন, এবং করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় বা মধ্য-আসিয়ার-রক্ত সংযুক্ত লোকেরা বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয়গণ হইতে কিসে শ্রেষ্ঠ, আমরা বুঝিনা। বাঙ্গালী পঞ্জাবে পর্য্যন্ত হাকিমের জাতি বলিয়া পরিচিত। কুস্তি কি ব্যায়াম সকল সময়ে ম্যাজিষ্টেট বা হাকিমগণের লাগেনা, ধীর বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি, উদ্যোগীতা, কার্য্যপ্রিয়তা যাহা বিচারকের উপযুক্ত গুণ, এবিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন ইংরাজ বাঙ্গালীকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সবজজের কোর্টে মোকদ্দমা আসিলে লোকের সুবিচারের আশা থাকে, ইউরোপীয় জজের নিকট আসিলে ভয়ে কম্পিত হয়। কিন্তু সুবিচারক উভয় জাতির মধ্যেই আছে। কোন নূন্যাধিক্য তাহাদের ভিতরে লক্ষিত হয় না। হাইকোর্টে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জজগণের কার্য্যকুশলতা ও বিচারশক্তি প্রশংসিত হইয়াছে। সুতরাং দেশীয় বলিয়া যে কোন ঘৃণার কথা আছে, আমার মনে এরূপ হয় না।

বঙ্গ ভঙ্গ সময়ে যদি কে, জি, গুপ্ত নূতন পূর্ব্ব বঙ্গের লাট হইতেন, আমার বিবেচনায় বঙ্গের অশান্তি অনেক পরিমাণে কম হইত, তবে ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই, কেননা, তাহা হইলে আবার বঙ্গ বিচ্ছেদ রহিত নাও হইতে পারিত। এবং তাহা না হইয়াও প্রজাগণ সুখ শান্তি সম্ভোগ করিত। আমরা তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম, যদি প্রজাবর্গকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইত, যদি ভক্তিভাজন নেতৃগণকে অপমান না করিয়া তাহাদিগকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইত, কুমিল্লা ও জামালপুরের গোলযোগ সময়ে ম্যাজিষ্টেটগণ দেশীয়গণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতেন, "Go to Bipin Pal and Surendra Banerjee", না বলিতেন, যদি তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য কোন সভা বা আমোদ প্রমোদ বা খেলা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবেন, তবে কোন গোলযোগ নাও হইতে পারিত। সে বিষয়ে দেশীয়ের মস্তিষ্ক কৃতকার্য্য হইত। বিদ্বান হও বা পণ্ডিত হও, বহুদর্শীতা ও লোক-হৃদয়-পাঠ লোকের সহিত না মিশিলে লাভ করা যায় না। কিন্তু ইউরোপীয়গণ দেশীয়গণের সহিত মিশেন না। তাহাদের সংবাদদাতা মুসলমান orderly, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে, সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের রীতি নীতি তাহারা অবগত নহে, অথচ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেই হইবে, কাজেই একটা সহজ অর্থ করিয়া দেয়, যেমন বন্দে-মাতরং অর্থ বান্ধ আর মার। লোকের বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, অনেক সময়ে হইয়াও থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভালরূপ চেষ্টা করা উচিত। Census যখন নূতন হইল, তখন লোকে শুনিয়াছিল, সরকার হইতে একরূপ বালা আসিয়াছে, বলবান লোক, যাহাদের হাতে সেই বালা লাগিবে, তাহাদের ধরিয়া লইয়া পল্টনে ভর্ত্তি করিয়া দিবে।

একজন মাঝি আমাকে বলিল যে, আমি তিন দিন না খাইয়া খালের মধ্যে শুইয়া ছিলাম। একথা কি কোন কর্ম্মচারী অবগত আছেন? যত গোল, এই ভ্রমবুদ্ধির জন্য। সিপাহি-বিদ্রোহ, বোম্বে প্লেগ সময়ের গোলযোগ, এ সকল কেবল ভ্রমবুদ্ধির জন্য। লোকে ভুল বুঝিয়াছিল, তাহা সংশোধিত হয় নাই। যদি উপযুক্ত লোক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ বা দেশীয় বুদ্ধিমান লোকদিগকে দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সুশাসনের জন্য প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই এসকল করা হইতেছে, তবে কোন গোলযোগই হইত না।

দেশীয়গণের একসময়ে বড় গণ্ডগোল হয়, ইউরোপীয় আসামী হইলে। একজন বাঙ্গালী সব ইনস্পেক্টর এক সাহেব মেনেজারকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব পিস্তল লইয়া গুলি করিতে আসিলেন, সব-ইনস্পেক্টর ভয় না পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন, বেত্রাঘাতচপেটাঘাত না হইয়াছিল, এমন নহে। এখানে এরূপ দুর্দ্দান্ত আসামীকে গ্রেপ্তার জন্য সব-ইনস্পেক্টরের পুরস্কার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সব-ইনস্পেক্টরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাইলেন, সাহেব আসামী চেয়ার পাইলেন! এ বিষয় বুদ্ধির বাহির। এই কারণে দেশীয় Civiliangণ can not manage their European Subordinates. ইহা তাঁহাদের দোষ, না, সাহেবদের স্বজাতি পক্ষপাতের দোষ? একজন হাকিমকে জানিতাম, তাঁর অযোগ্য Favouriteগণকে তিরস্কার করিলে তিনি নির্দ্দোষ আমলাদিগকে জরিমানা করিতেন। বিচার আসনে বসিয়া পক্ষপাত করা অতিশয় অযৌক্তিক।

সমুদয় বিবেচনা করিতে গেলে দেশীয় ও ইউরোপীয় সিবিলিয়ানগণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে, আমরা মনে করি না। বরং অনেক গুণে দেশীয়গণ ভাল। তাঁহারা হঠকারী নহেন, সুরাপান, চরিত্র-দোষ বিশেষতঃ তাঁহাদের অতি অল্প। দেশীয়দিগের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন, ও তাঁহাদের প্রকৃত অভাব বুঝিতে পারেন। আর যদি Assam for the Assamese, বেহার বেহারীর জন্য, উড়িষ্যা উড়িয়ার জন্য, এই যুক্তি ঠিক হয়, তবে Bengal for the Bengalees এবং ভারত ভারতবাসীর জন্য, সেই যুক্তি কি খাটে না? সুতরাং ইউরোপীয় বেশীর ভাগ রাখিবার প্রয়োজন কি? উচ্চপদ সকলও কেবল তাহাদের একচেটিয়া করা কেন?

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

মহানিদ্রায় মহাপ্রাণ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"
(গীতা)।

হৃদয়ের প্রিয়তম সখা!
জীবনের সব কাজ না হ'তে সাধন
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলে কি আজি অসময়?—
অবসন্ন কলেবর, শিথিল নয়ন,
নিমগ্ন হইলে কিগো গভীর নিদ্রায়?

স্নেহময়ী জননীর অঙ্ক পরিহরি
বিশ্ব-জননীর কোলে পড়িলে ঢলিয়া,
চির শান্তি লভিবারে এ কি বেশ ধরি
জীবনের পরপারে যাইছ চলিয়া ?

এত শীঘ্র সব আশা শেষ হ'য়ে এল!
ধীরে ধীরে প্রাণ-দীপ আসিছে নিবিয়া,
মরমের সাধ যত নিমেষে ফুরাল,
অহহ! ছাইল ঘোর বিষাদের ছায়া!

নিষ্ঠুর নিয়তি!
এই কি রে তোর মনে ছিল দুরাত্মন্?
রত্ন গর্ভা জননীর কোল হ'তে হায়!
স্নেহাস্পদ পুত্র-রত্নে করিলি হরণ,
ছিন্ন করি মায়া-ডোর অতি অসময়!

পতি-প্রাণা ললনার বক্ষ বিদারিয়া
ছিঁড়িলি কণ্ঠের হার—অমূল্য ভূষণ;
অকালে যোগিনী-বেশে তারে সাজাইয়া
বিষ-ভরা স্বার্থ তোর করিলি সাধন ?

ভাই ভগিনীর প্রাণ মথিত করিয়া,
মর্ম্মাহত করি যত আত্মীয় স্বজন,
গভীর শোকের ছায়া পশ্চাতে ফেলিয়া,
কেড়ে নিলি সকলের আদরের ধন ?

রে নিষ্ঠুর দুরাচার!
কতকাল কত রত্ন করিলি হরণ,
বিশাল উদর তোর তবু পূরিল না,
পাপ-কার্য্যে এত তুই রত অনুক্ষণ,
গ্রাসিতে স্নেহের ধনে মমতা হ'ল না ?

হায়! বৃথা নিন্দি তোমা—বিধির বিধানে
কাল পূর্ণ তাঁর—তাঁরে কে পারে রাখিতে,
অসার সংসার ছাড়ি দেব-নিকেতনে
চলেছেন সখা, তাঁরে কে পারে রাখিতে ?

এ পারের কাজগুলি ত্বরা শেষ করি,
দিব্য-ধামে দিব্য-কাজ করিতে সাধন
চলিলেন সখা, স্থূল-দেহ পরিহরি
সুখে পরপারে, লভি নূতন জীবন!

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

এস এস সবে হেথা আছ কে কোথায়,
মরমের শেষ দেখা দ্যাখো প্রাণ ভরে;—
এ জীবনে আর দেখা হবে না ধরায়,
চুপে চুপে আসি দেখে যাও ধীরে ধীরে।

জননীর অঙ্কে যথা নির্ভয় অন্তরে
ঘুমায় আরামে ক্ষুদ্র তনয় তাঁহার,
জগত-জননী কোলে মহা ঘুম-ঘোরে
অচেতন স্পন্দহীন সুহৃদ্ আমার!

শেষ হইয়াছে তাঁর জীবন-সংগ্রাম,
সমর-বিজয়ী তিনি হৃদয়ের বলে,
সুনিদ্রায় লভিছেন বিপুল বিরাম।—
জীবনের অবসাদ গিয়াছেন ভুলে।

দেখো যেন ভাঙ্গে নাকো সমাধি তাঁহার,
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া এস সাবধানে,
মহা ধ্যানে নিমগন সুহৃদ আমার—
রয়েছেন তন্দ্রাবেশে স্তিমিত নয়নে!

করিওনা কোলাহল, হ'য়ো না বিহ্বল
অনিমেষ মুখ পানে দ্যাখো গো চাহিয়া,
ক্ষণকাল রোধ করি নয়নের জল
দ্যাখো কি সুন্দর ভাব উঠেছে ফুটিয়া!

বিস্তৃত নয়নে তাঁর কি জ্যোতি ভাতিছে,
স্থির নেত্র কার পানে আছে উন্মীলিত,
প্রশান্ত আননে আহা! কি হাসি ফুটিছে--
জগত-জননী-ধ্যানে চিত্ত অবহিত!

অই দেখা যায় দূরে আনন্দের ধাম,
রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ নাহিক যথায়;--
চির সুখ, চির শান্তি, সদা অনুপম
বহে তথা পলে পলে সুধার ধারায়!

সেই মহা পুণ্য-তীর্থে চির শান্তি আশে
শ্রীগুরু-চরণ স্মরি সকল-জনম,
লয়ে, মাতৃ-পদধূলি বিপুল হরষে
মহাযাত্রা করিছেন বাল্য-সখা মম।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

ফিরাইয়া আঁখি হের বিস্ময়-আবেশে
মূর্ত্তিমতী শক্তিরূপা জননী আমার
বসি যোগাসনে মহা যোগিনীর বেশে
মাগিছেন আশীর্ব্বাদ জগত্‌-মাতার।

কে দেখেছ হেন দৃশ্য বল কভু শুনি,
জননীর কোল হ'তে কেড়ে নিয়ে যায়
জীবন-জুড়ান ধন—নয়নের মণি,
চিহ্ন মাত্র নাহি তার রহিবে ধরায়,—

হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া হৃদয়ের ধন
অকালে চলিয়া যায় অবিজ্ঞাত দেশে,
চিরতরে, ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন,
উথলিছে মহা শোক তাঁর চারি পাশে।

তিনি কিন্তু অতি স্থির নীরব নিশ্চল,—
মুখে নাই হা হুতাশ একটীও কথা,
নেত্রে নাহি ঝরিতেছে এক বিন্দু জল,—
মরমে আবদ্ধ তাঁর মরমের ব্যথা,

করুণ নয়নে মরি ব্যথিত পরাণে
একাগ্র অন্তরে হের যুড়ি দুই কর,
মাগিছেন অভয়ার পবিত্র চরণে
বংসের কল্যাণ তরে সুমঙ্গল বর।

নির্ব্বাত প্রদেশে যথা দীপ-শিখা হায়!
বিকাশে নিষ্কম্পভাবে দীপ্তি আপনার,
শোকের তরঙ্গ-মাঝে বিষাদ-ছায়ায়
পাইতেছে জননীর স্ফূর্ত্তি সাধনার।

ধন্য দেবি! ধন্য তব বিপুল সাধনা,
আর মুগ্ধ মোরা, আজি এ ঘোর দুর্দ্দিনে
পাসরি মরমভেদী শোকের যাতনা,
পাইনু অদ্ভুত শিক্ষা বিধির বিধানে!

অরে মুগ্ধ মন মম, কি আজ দেখিলে?
আর কি দেখিবে হেন দৃশ্য অনুপম?
ভীষণ ঝটিকা-মাঝে কি শিক্ষা লভিলে?
কভু কি লভেছ হেন শিক্ষা মনোরম?

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

কে তুমি গো চারুশীলে অয়ি বিষাদিনি
ঝরিতেছে মরি মরি নয়ন আসার?
বুঝিয়াছি সুহৃদের জীবন-সঙ্গিনী
আলো করি বসে আছ চরণে তাঁহার!

কেঁদনা ভগিনি, উঠ, মুছ অশ্রুজল,
বৃথা শোক, বৃথা দুঃখ করো না কল্যাণি,
ধৈর্য্য-সহায়ে প্রাণে পাবে নব বল;—
দিবেন বিপুল শান্তি জগত-জননী।

সত্য বটে তাঁর সনে এ নর-জীবনে
স্থূল দেহে আর নাহি হইবে মিলন;
পতি বনিতার গতি জীবনে মরণে—
দিব্যধামে পুনরায় মিলিবে দু'জন।

পরিণয় নহে শুধু পার্থিব বন্ধন,
জীবনান্তে দম্পতীর যোগ না ফুরায়—
গেলে একজন চেয়ে থাকে অন্যজন
পরলোক-পানে; দোঁহে মিলে গো তথায়।

হৃদয়ে হৃদয়ে আর আত্মায় আত্মায়
বাঁধা যাহে নর-নারী বিধির বিধানে,
জীবনের অবসান হইলে ধরায়,
সে কিহা বন্ধন বল টুটিবে কেমনে?

এ সংসার হায়! হায়! দু'দিনের তরে,
দু'দিনের হাসি হেথা দু'দিনে ফুরায়।
দু'দিনের তরে ফুল ফুটে যায় ঝ'রে—
দু'দিনের তরে মাত্র সুবাস বিলায়!

যে শান্তির রাজ্যে আজি তব সহচর
পশিছেন হৃদয়ের চারু শোভা-বশে,
সে রাজ্যের লোক সব অজর অমর—
রোগ শোক দুঃখ তাপ তথায় না পশে।

সেথায় বিরহ নাই মধুর মিলনে,
সেই পুণ্যময় দেশে সকলই সুন্দর,—
সব মধুময় সেই অমর-ভবনে,—
সদানন্দময় চিরশান্তির আগার!

যতদিন এ সংসারে রহিবে বাঁচিয়া,
তাঁর-স্মৃতি হৃদি-মাঝে সতত জাগিবে

করিলে স্মৃতির পূজা হৃদয় ভরিয়া
ত্রিভুবনময় তাঁরে দেখিতে পাইবে।

যে কাজ অপূর্ণ রাখি গেছেন তিনি,
যথাসাধ্য সেই কাজ সাধিয়া যতনে,
সহধর্ম্মিণীর ব্রত পালিও ভগিনি,
আত্মসমর্পণ করি শ্রীগুরু-চরণে।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

অকালে প্রাণের সখা চলিলে আমার
অপার অনন্ত-ধামে শান্তির আলয়ে,
শুনে যাও দুটিকত কথা অভাগার,—
হৃদয়ে রেখেছি যাহা যতনে লুকায়ে।

বাল্যকালে মিলেছিনু মোরা দুইজন,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা হ'য়ে প্রণয় বাঁধনে,
মধুর স্বভাবে তব ক্ষুদ্র মম মন
কি যে মজেছিল, তাহা বলিব কেমনে!

শৈল-বক্ষ হ'তে যথা ক্ষীণ জলধারা
উথলিয়া ক্ষুদ্রাকারে ধায় পুরভাগে,
যত যায় লভি পুষ্টি হয়ে আত্মহারা
গভীর স্বননে ছুটে খরতর বেগে,

স্নিগ্ধ করি দূরব্যাপী বন উপবন
হাসে ধরা তৃণ-ফুল ফলে দুই কূলে,
ধরণীর উর্ব্বরতা করি সম্পাদন,
বিচিত্র তরঙ্গে নদী চলে হেলে দুলে,

মধুর প্রণয় তব বাল্য-হৃদি হ'তে
উথলিয়া পরিপুষ্টি লভি দিনে দিনে
প্লাবিয়াছে হৃদি প্রাণ মোর বিধিমতে,
ঢালিয়াছে কত শান্তি উত্তপ্ত জীবনে।

বাল্য কালে বেঁধেছিলে যে প্রণয়-ডোরে
তৃপ্তি তায় জন্মে নাই তব, জানি মনে,
তাই নিজ হাতে ভাই বেঁধেছিলে মোরে
আর এক সুকোমল-কঠিন বন্ধনে।

কত কথা আজি ভাই জাগিছে মরমে,
কত সাধ কত আশা অপূর্ণ রহিল,
তুমি গেলে চ'লে, পিছে ফেলিয়া অধমে,
অতৃপ্ত প্রাণের তৃষ্ণা আর না মিটিল

থাক্ ভাই চাপা থাক্ সে সকল কথা,
মরমের কথা থাক্ লুকান মরমে,—
প্রাণের বাসনা কভু মিটে নাকো হেথা,
দুদিনে ফুরায় সব সাধ এ জনমে!

যদি দেখা হয় জীবনের পরপারে,
মিলিব আবার তথা মোরা প্রাণে প্রাণে;
জানাইব অন্তরের কথা প্রেমভরে
গলাগলি হ'য়ে বসি দু'জনে বিজনে!

জানি আমি প্রণয়ের অন্ত কভু নাই;—
একবার প্রাণে প্রাণে হইলে মিলন,
দু'টী প্রাণ একস্রোতে বহিবে সদাই,
অনন্ত কালেও লয় পাবে না কখন।

স্বভাবের শিশু সম জীবন কাটালে
পর-হিতে মহাপ্রাণ হরষে সঁপিয়া,
কি কাজে আসিয়াছিলে, কি করিয়া গেলে,
মধুর কাহিনী তাহা কহিবে কাঁদিয়া।

যে কীর্ত্তি রাখিয়া তুমি প্রিয় দরশন,
পশিছ পবিত্র প্রাণে পুণ্যময় পুরে,
সে বিপুল যশোভাতি হবে না মলিন;—
রবে সদা সমুজ্জ্বল স্মৃতির মন্দিরে!

পূর্ণ উচ্ছ্বাস।

একবার দ্যাখো ভাই দিব্য আঁখি মেলি
তোমা তরে কতপ্রাণ হয়েছে বিহ্বল;—
কত শোক চারি দিকে উঠিছে উথলি,
ঝরিতেছে কত অশ্রু বেগে অবিরল!

স্নেহময় * সখা তব উদার-হৃদয়,
পরহিতে সমর্পিত সদা যাঁর প্রাণ,
বিপুল সংগ্রামে হায়! মানি পরাজয়
কাঁদিছেন অশ্রুবারে অবসন্ন-মন!

আর দ্যাখো স্নেহাস্পদ প্রাণের সোদর,
সহৃদয় কীর্ত্তিমান বংশের গৌরব,
পর উপকার তরে জনম যাঁহার,
চৌদিকে ছুটিছে যাঁর যশের সৌরভ।

* ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বসু।

প্রাণারাম সেই তব হৃদয়ের "জ্যোতি"
কি গভীর শোকে মগ্ন তোমার বিরহে ;-
প্রশান্ত হৃদয় তাঁর উছলিত অতি,
কাঁদিছেন ঘোর দুঃখে দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে।

আর দ্যাখো চাহি পাশে আত্মীয় স্বজন,
স্নেহের 'তারক','লীলা','প্রভাত','বিমল',
বড় আদরের সব ভাই ভগ্নীগণ
কাঁদিছে তোমার লাগি হইয়া বিহ্বল।

এতদিন যাহাদের আদর যতন
মুগ্ধ রেখেছিল তোমা দিবস রজনী,
ছিন্ন করি তাহাদের মমতা-বন্ধন
কেমনে যাইছ চলি বারণ না মানি।

এতগুলি হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন
রাখিতে তোমায় হেথা পারিল না হায়।
সকলের মর্ম্মস্থল করিয়া দাহন,
নিতান্তই যাবে তুমি আজি অমরায় ?

তবে যাও ভাই,
জননীর বুকভরা ভালবাসা নিয়ে,
নিয়ে মধুময় প্রেম চিরসঙ্গিনীর,
আত্মীয় বন্ধুর প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি ল'য়ে,
ল'য়ে সুধাময় স্নেহ ভাই ভগনীর,

যাও সে আনন্দ-ধামে আনন্দিত মনে,
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা যথা স্তরে স্তরে
রয়েছে তোমার তরে সুন্দর বিধানে,
কর উপভোগ তাহা সুখে প্রাণ ভ'রে।

পিতৃদেব পিতামহ তব সেই দেশে,
রয়েছেন ফুল্ল মনে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি গিয়া আলো করি তাঁহাদের পাশে
বসিবে উল্লাসে তথা অতুল শোভায়!

তাঁদের বড়ই তুমি আদরের ধন,
চলিয়াছ তাঁহাদের পদ-চিহ্ন ধরি
জীবনের লক্ষ্য পথে সুখে চিরদিন,
লভেছ বিপুল শান্তি স্বার্থ পরিহরি।

দীর্ঘ বিরহের পর তাঁদের পাইয়া,
লভিয়া তাঁদের পুনঃ আদর যতন,
সংসারের তাপ-জ্বালা যাইবে ভুলিয়া
গভীর শান্তিতে সদা রবে নিমগন!

লভেছিলে ঋষিকল্প পিতামহ-পাশে
যে শিক্ষা শৈশবে, হয়েছিলে সংগঠিত
যে উচ্চ আদর্শে, আজি তাহার বিকাশে
ক'রে গেলে সকলের চিত্ত বিমোহিত!

থাকো চিরসুখে জ্যোতির্ম্ময় অমরায়
বিশ্ব-জননীর কোলে বসিয়া হরষে,
স্বভাবের চারু শোভা বিকাশি তথায়
সুশোভন। সুর-পুরে সুরগণ-পাশে।

জগত-জননি। চির বিরামদায়িনি।
কোলে তুলে লও মাগো তনয়ে তোমার,
পরিশ্রান্ত সন্তানের সম্মুখে জননি,
খুলে দাও স্নেহভরে অমৃত-ভাণ্ডার।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

একটী প্রশ্ন। (১ম অংশ)

ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ইতিহাস আমি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছি। দল বা সম্প্রদায় হিসাবে ইহার মূল্য যতই হউক, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হিসাবে মূল্য বড়ই অল্প হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য অল্প, সেটা অতি বৃহৎ আলোচনা, আমি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই, আর সেরূপ উচ্চ সমালোচনার শক্তি ও বিদ্যা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমি যে বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ঐ পুস্তকের ভ্রম ত্রুটীর আলোচনা করিয়াছি,* সেগুলির জন্য খুব বেশী বিদ্যা বা অধিক

* উল্লিখিত বিষয়টী ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে।

শক্তিরও প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার আলোচনায় অসঙ্গতি দোষ ও ইতিহাস হিসাবে বহু বহু বিষয়ের অনুল্লেখ, এই দুটী বিষয়ের আলোচনা আমি করিয়াছি মাত্র।

রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ে ভারতে ও সমগ্র পৃথিবীতে যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে যুগের মনীষিগণের বিশেষ ভাব জগতে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বপতি পরমেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা, সেই মহা যুগের মহাপুরুষের উত্তর-সাধকগণ কি ভাবে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সে বিরাট আদর্শ হইতে ব্রাহ্মসমাজ কত দূরে আছেন, কি কি নিয়ম পদ্ধতি ও সাধনাদি অবলম্বন কবিলে ব্রাহ্মসমাজ ভারতে ও পৃথিবীব অন্য নানাস্থানে এই মহা আদর্শেব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন, সে আলোচনার ইঙ্গিত এ ইতিহাসে নাই। ইহাতে আদি, আদি হইতে ভাবত-বর্ষীয় ও ভাবতবর্ষীয় হইতে সাধাবণ ব্রাহ্ম-সমাজেব বিচ্ছেদ ও সেই সূত্রে সংঘটিত বিবরণ-মালা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজরূপ মহীরুহ প্রতিষ্ঠিত হওয়াব ফলে, এদেশে চিন্তার রাজ্যে যে যুগান্তব উপস্থিত হইয়াছে, সেই মহা যুগান্তবেব তাড়নায় ব্রাহ্মসমাজেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না রাখিয়াও ব্রাহ্মসমাজেব রীতি পদ্ধতি, ভাবভঙ্গী ও ভিতবের তত্ত্ব-বস্তু গ্রহণ কবিয়া কত স্বতন্ত্রদল গঠিত হইয়া গেল, এবং সেই সকল দল যে এ দেশে কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় মানবের আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগাইতেছেন, এবং পরম বস্তুর সহিত আত্মার গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, এ ইতিহাসে সে বৃহত্তর বিষয়েব কোন আলোচনা নাই। যথা আর্য্যসমাজ, বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভা, থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও কার্য্য কলাপ ও পরমহংস সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ে কোন আলোচনা নাই। কিন্তু এগুলি সবই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠাব ফল, এবং এগুলি ঠিক সে কালেব "ধর্ম্মসভাব" ন্যায় বিরোধী দল নহে। এই সকল পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ে আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের লোক যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এগুলিতে শক্তি বিধান কবিয়াছি, সে বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে? ঐ সকল সম্প্রদায়েব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, সত্য হিসাবে—ইতিহাস হিসাবে ইহার প্রতিবাদ চলে না।

সহসা বলেন্দ্র নাথ ঠাকুরের লোকান্তর গমন না ঘটিলে, আর্য্যসমাজেব সঙ্গে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের যে ঘনিষ্ঠতর যোগ এত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর পূর্ব্বোল্লিখিত সম্প্রদায় গুলিকে আমাদের সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিলে, এবং সেই সকল সম্প্রদায়েব লোক আমাদেব সমাজত্রয়েব উপব সহানুভূতি ও সাহচর্য্যেব জন্য সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিলে যে কিছু দোষের বিষয় হয়, তাহাও মনে হয় না, কারণ আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের লোকমণ্ডলী যখন পাশ্চাত্য দেশ সমূহের একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীকে আমাদের প্রেমালিঙ্গন দানে মুক্ত-হৃদয়,—তখন দেশের ঐরূপ সম্প্রদায় সকলের উপর সেরূপ ভাব সর্ব্বদাই পোষণ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে? তাঁহারা বিদেশী এবং ইঁহারা স্বদেশী বলিয়া ভিন্নভাব হওয়া কোনও মতে সঙ্গত নহে। কিন্তু ইতিহাসে ও ব্রাহ্মসমাজের আচার আচরণে এইরূপ ভিন্নভাব দেখা যায়। প্রমাণস্থলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক সভাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইতিহাসে ও সমাজের সভাপতির বক্তৃতায় ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি মাতৃস্তন্যের ন্যায় প্রেমের ধারা বর্ষিত হয়, কিন্তু এদেশের ঠিক ঐরূপ সম্প্রদায়গুলির প্রতি একটা বাক্যব্যয় নাই ও থাকে না। ইহাই কি এদেশের জনমণ্ডলীর সহিত ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার উত্তম পদ্ধতি ?

এ বিষয়ে বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বলিবেন যে, আর্য্যসমাজে হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও বেদে অভ্রান্ততার আরোপ ইত্যাদি দোষ বর্ত্তমান, আর পরমহংস সম্প্রদায়ে গুরু ও অবতারবাদের প্রবল আধিক্য, সুতরাং ব্রাহ্মগণ কেমন করিয়া এসকল ব্যাপারের প্রশ্রয়দাতা হইবেন ? ইহারও সদুত্তর বর্ত্তমান, নববিধান সমাজে নববিধানের পতাকাবরণ, ও বেদী চিরদিনের জন্য শূন্য রাখা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা সাধারণ সমাজের জনমণ্ডলী তাঁহাদের সহিত সর্ব্ববিধ সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা করিতেও ইতস্ততঃ করি না। আমরা সকলেই নববিধানের লোকদিগকে নিজেদের লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আর এক কথা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পল্লীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের নানা মুনির নানা মত। সংপ্রতি ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জারে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক দীর্ঘ জারি করিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্ম্মবীর শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেবালয় ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির পরিপোষক নহে। কেবল তাহাই নহে, দেবালয়ের দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের মহদুদ্দেশ্যের বিবিধ বিঘ্ন ঘটিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ সাধারণ সমাজের প্রধান পক্ষীয় অনেকে ইহার কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই বেশ জানেন। এরূপ স্থলে, ব্রাহ্ম-সমাজের মত, বিশ্বাস ও আদর্শের কোন স্থিরতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মণ হইলে উপবীত রাখেন, এবং বিবাহে হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে, তাঁহাদের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতেও কোন বিঘ্ন হয় না। কেবল পরমহংস সম্প্রদায়, থিয়জফিক্যাল সোসাইটি, আর্য্যসমাজ ইত্যাদি জনসঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় এবং তাঁহাদিগকে এক পথের পথিক বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি কেন ? যদি ব্রাহ্মপ্রধানগণ এই সকল কার্য্যকে ব্রাহ্মসমাজের আংশিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ইতিহাসে এ সকল কর্ম্মক্ষেত্রের কোন প্রকার উল্লেখ নাই কেন ? ভবিষ্য-ভারতে একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী (ব্রাদারহুড্) প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কি আত্মহত্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে না ?

আমরা যদি মনে করি, আমাদের মাপ্-কাঠিতে মাপা ধর্ম্মমত, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মের আদর্শই এককালে জগতের লোক-মণ্ডলীর নিয়ামক হইবে, তাহা হইলে খুব ভুল হইবে, এবং সেটা কোন কূপমণ্ডূকের কল্পনায় সমুদ্র সন্তরণ বলিয়াই লোকের নিকট পরিহাসের বস্তু হইবে। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস এই শ্রেণীর লোকের চিন্তার পরি-পোষক। ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কোন্ কোন্ অংশ ব্রাহ্মসমাজে সুরক্ষিত ও পরিগৃহীত, কোন্ কোন্ অংশ অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর পৃথিবীর নানাদেশীয় সভ্য সমাজেও রীতি নীতির কোনগুলি ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়া-

ছেন এবং সে সকল গ্রহণ করার ফলে ব্রাহ্ম-সমাজ এ দেশের প্রাচীন সমাজের তুলনায় কতটা লাভবান হইয়াছেন, তাহারও ইঙ্গিত থাকা উচিত ছিল। এ সকলের কিছুই নাই। ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও অগ্রগমনের পশ্চাতে কোন প্রাচীন সভ্যতা-সঙ্গত জনমণ্ডলীর আদর্শ ও ইতিহাস বর্ত্তমান ছিল না। কোল, ভিল, সাঁওতাল ও অন্য অসংখ্য পার্ব্বত্য জাতি-পূর্ণ ভাবক্ষেত্রে সহসা রামমোহনের অভ্যুদয় হইল, আর সমাজ সংস্কার চেষ্টা ও তজ্জাত সমাজ-সংগ্রাম ও একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সূত্রপাত হইল, খ্রীষ্টীয় প্রচারক-গণ এরূপ ভাব পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার দলস্থ আমরা এরূপ ভাবিলে দেশের লোক মার্জ্জনার দৃষ্টিতে দেখিবে না।

তাহার পর বর্ত্তমান সময়ে দেশের গৌরব-স্থল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিদিত ব্যক্তিবর্গকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াও ব্রাহ্মসমাজ কেন দিন দিন হীনদশা প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহার গোপন-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন ব্যাপার। ইঁহাদিগের জীবন ধারণ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত ও বর্দ্ধিত হইলে, হয়ত ইঁহাদের ও ইঁহাদের সমাজের শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা হইত। ইঁহারা যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ও ব্যস্ত, সেই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কতটা বল লাভ করিয়াছেন, ইতিহাসে সে বিষয়ের ইঙ্গিত নাই! অংশে দেশের শিক্ষিত সমাজ জ্ঞান-বৃদ্ধি নিবন্ধন ঐ সকল মহাত্মাদের সাধনার ফল সম্ভোগে ব্যস্ত। আর ব্রাহ্মসমাজ "ঘোড় বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি ঘোড়" লইয়া ব্যস্ত; ইতিহাসও সেই ধাতু প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজে দর্শন দিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে শিক্ষিত সমাজে বিদ্যানুরাগ, বিদ্যাবত্তা, গবেষণা ও ভূয়োদর্শন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ এই বিরাট মানব সমাজ গঠনে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছেন। তাই ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে বিনয়, সৌজন্যশীলতা, শিষ্টাচার দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর আমাদের সমাজে বালক বৃদ্ধ সকলেই "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" পরব্রহ্মকে পাইয়া আনন্দে দিশাহারা ও অহঙ্কারে উন্মত্ত। অধুনা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়-দ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিব্রত দেখিয়া প্রাণে একটু আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে সত্য, কিন্তু আদর্শের সঙ্কীর্ণতা যে ভাবে অস্থি মজ্জা অধিকার করিয়াছে, তাহাতে আমাদের কল্যাণ যে সহজে সাধিত হইবে, তাহা মনে হয় না। ব্রাহ্ম সাহিত্যে ও ব্রাহ্মশিক্ষায় যাহাতে এই সঙ্কীর্ণতা দৃঢ়মূল হইয়া বসিতে না পায়, সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাতের আবশ্যক। আমার গ্রন্থের প্রথমাংশে, ইহাই প্রথম নিবেদন। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্ঞান ও অবিদ্যা।

সেই সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্যে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে যে সকল গুণ, বৃত্তি বা শক্তি সমাহিত করিয়াছেন, তাহাদের একটী অনুকূল রূপে কর্ত্তব্য পালনার্থে জীবের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া এবং অপরটী প্রতিকূলতা সাধন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের কি অদ্ভুত উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাহার মীমাংসা ও ব্যুৎপত্তি সাধন ক্ষুদ্র মানব জ্ঞানে কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তথাপি সেই শক্তিময়ের যে পরিমাণ শক্তি মানব যন্ত্রে সুন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্ততঃ এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, আলোকের পার্শ্বে অন্ধকারের সন্নিবেশ না থাকিলে, আলোকের গুণ বা শক্তি-জ্ঞান কখনই পরিস্ফুট হইতে পারিত না। এইরূপে প্রত্যেক প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও অনুভব-সিদ্ধ বস্তু বা বিষয়ে প্রতিকূলতার সন্নিবেশ থাকায় জীবে অধম হইতে উত্তম সুতরাং উত্তম অধম জ্ঞান পরিস্ফুট ও পরিরক্ষিত হইতেছে।

মানব এই যুগপৎ সহগামী অনুকূল ও প্রতিকূলতার সংঘর্ষস্থলে থাকিয়া স্থির ভাবে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, এই জগৎ গৃহের গুরুকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারে; কিন্তু দৈবতঃ জ্ঞান লইয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে স্খলিত হইলেই ভীষণ সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এ অবস্থা হইতে সংশোধিত বা সমুত্থিত হওয়া বড়ই কঠিন; তবে পূর্ব্ব কর্ম্মফলে সেই কৃপাময়ের একমাত্র কৃপা-কটাক্ষপাত সংঘটনে তাহারও পক্ষে কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না।

সকল অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিসমষ্টির মধ্যে জ্ঞান ও অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে সকল সময়ে মানবমণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া পরিচালন করিতেছে। অবিদ্যা সম্পূর্ণ-রূপে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়া অধর্ম্মপথে অর্থাৎ অকর্ত্তব্যসাধনে পরিচালিত করিতে শক্তিশালিনী সুতরাং অবনতির চরম স্বরূপ নিরয়দায়িনী এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে কর্ত্তব্য সমাহিত রাখিয়া ধর্ম্মবলের সংস্থিতি সাধন ও সত্যপথ প্রদর্শন পূর্ব্বক উন্নত হইতে উন্নততর, উচ্চ হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর স্বরূপ ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রদান করে।

মানব নিয়ত অপরিবর্ত্তিত রূপে এই জ্ঞান ও অবিদ্যা শক্তির সংঘর্ষ স্থলে অবস্থিত আছে; আকর্ষণ উভয়েরই প্রবল, আকর্ষিত হইলে উভয়ের শক্তিই অসীম, তবে দুর্ব্বলের পক্ষে অবিদ্যার আকর্ষণ বড়ই প্রবল, বলবান তাহার আকর্ষণ হইতে সহজেই দূরবর্ত্তী হইতে হইতে জ্ঞানের আকর্ষণে পতিত হয়; তখন আর তাহার আকর্ষণের কোন আশঙ্কাই থাকে না। অবিদ্যার আকর্ষণ বল তাহার নিকটস্থ হইতেও সক্ষম হয় না; একমাত্র জ্ঞানের বলই তাঁহার অবলম্বন স্বরূপ হয়।

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞতাই জ্ঞানের বল এবং আত্মতত্ত্বে ভ্রান্তিই ইহার দৌর্ব্বল্য বা অবিদ্যা শক্তি প্রবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ।' আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাস অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পালন-পরায়ণ হইয়া উন্নতমুখী জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে

উত্থিত হইতে হইতে উন্নত স্থান প্রাপ্ত হয়। আর আত্মতত্ত্ব ভ্রান্ত অবিদ্যার প্রবল আকর্ষণে সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানমার্গ হইতে দূরে নীত হয় এবং সংসার অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম অবলম্বনে ভূতাত্মক দেহের ভোগে লালায়িত থাকিয়া কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হয় এবং অবনতমুখী নিরয়-পথে সবেগে নীত হইতে থাকে। এ পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইলেও প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় স্বরূপ জ্ঞান সর্ব্বক্ষণই সমীপবর্ত্তী রহিয়াছে। যাহার পূর্ব্ব কর্ম্মফল স্বরূপ কর্ম্মভোগ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত থাকে এবং যে স্থির বা অটল ভাবে ভোগ সমাপ্তি জন্য আগ্রহাতিশয্য অবলম্বন করে, সে সেই জ্ঞানের বল আশ্রয় করিতে শক্ত হয় এবং অবিদ্যার আকর্ষণ পূর্ব্বক সংসার-মুক্ত হইয়া, সন্ন্যাস অবলম্বনে প্রত্যাবর্ত্তিত ও পুনর্ব্বার উন্নতমুখী পথাবলম্বনে উত্থিত হইতে থাকে।

আমি কে এবং কি উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত, কাহার দ্বারাই বা নিযুক্ত এবং কি শক্তির দ্বারাই বা উহা সাধনক্ষম, ইহার সত্য তত্ত্ব যাহাতে পরিস্ফুট থাকে, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং যে সেই আত্মতত্ত্ব-বিস্মৃত সুতরাং কর্ম্ম-স্খলিত হইয়া ভূতাত্মক দেহকেই সর্ব্বাধার ধারণা পূর্ব্বক আসক্তি-পরবশ হইয়া তাহারই ভোগ লালসায় কর্ম্মাচরণ করে, তাহাকেই আত্মতত্ত্ব-ভ্রান্ত অহংসর্ব্বস্ব বা অহঙ্কারান্ধ কহে। আত্মতত্ত্ব-ভ্রান্তের যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু অভিজ্ঞতা, সে সমস্তই সঙ্কীর্ণ ভাবাপন্ন এবং তাহার ক্ষুদ্র দেহেরই অন্তর্ভূক্ত থাকে, তদ্বহির্ভাগে তাহার কোন অধিকারই থাকে না, এই অসীম বিশ্বের অত্যাশ্চার্য্য সৃষ্টিবিবরণ এবং চতুর্দ্দিকস্থ অতুল অপরিমেয় দৃষ্টান্ত তাহার চক্ষু সান্নিধ্যে থাকিলেও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে না, সুতরাং সে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যা কবলগত হইয়া থাকে। তাহার উন্নত মার্গ প্রাপ্তির পর্য্যালোচনা এবং তৎপ্রাপ্তির জন্য অসারগর্ভ গবেষণা ইতস্ততঃ ধাবন, আড়ম্বর, আস্ফালন ইত্যাদিতে পরিণত হয় মাত্র, বস্তুতঃ সেই আড়ম্বর আস্ফালনাদি যতই প্রবল দেখা যায়, ততই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সে অবিদ্যার প্রবল আকর্ষণে বেগে অবনত পথেই অবরোহণ করিতেছে; এক্ষেত্রে তাহার আরোহণ-জ্ঞান কদাপি পরিস্ফুট বা ধারণা-সান্নিধ্য না থাকায় সে অবরোহণকেই আরোহণ মনে করিয়া অগ্রসরই হইতে থাকে।

সঙ্কীর্ণতা কখনই উন্নতির উপাদান নহে; উন্নতমার্গ বহুবিস্তৃত, অসীম ও সংখ্যাতীতের আধার স্বরূপ, আত্মতত্ত্বে অধিকার থাকা প্রযুক্ত উদার ভাবের সন্নিবেশ বা তাহা ধারণাবদ্ধ না হইলে কখনও উহাতে কাহারও আরোহণ করিবার শক্তি জন্মে না, আরোহণ করা দূরে থাকুক, তাহাতে পদার্পণ করিবার শক্তি, এমন কি, তাহার উপায়াবলম্বনের শক্তি পর্য্যন্তও সংস্থিত হইয়া উঠে না।

জ্ঞান অনবরত অক্ষুণ্ণ ভাবে উন্নত পথ প্রদর্শন ও আরোহণ শক্তি প্রদান করিতেছে; কিন্তু তাহাতে কোন আড়ম্বর নাই, কোন আস্ফালন নাই; স্থির এবং অটল ভাবে তাহার কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে; কাহাকেও জানাইতেছে না, জানাইবার জন্য ব্যগ্রও হইতেছে না, অথচ তাহার অনুবর্ত্তীগণ ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকরূপে উন্নত হইতে উন্নত স্তরে আরোহণ অর্থাৎ উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম্মে অধিকারী ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাহা আচরণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ উন্নত ভাবাপন্ন বা উন্নত ধারণা-সমাকীর্ণ হইয়া আত্মপ্রসাদ বা ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করি

তেছে। আর অবিদ্যার আড়ম্বরে যেন দিক ব্যাপ্ত হইতেছে এবং আস্ফালনে যেন জগৎ কম্পিত করিতেছে, কিন্তু সে সমস্ত অকিঞ্চিৎকর, কার্য্যতঃ সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক এবং অবনত পথে অবরোহণ-সংঘটিত করিবার কারণ স্বরূপ। অবিদ্যাশক্তি-চালিতের কোন কোন কর্ম্ম সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-সম্পন্নের পক্ষে উদার বলিয়া অনুমান হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তন্মূলে সঙ্কীর্ণতার নিদান স্বরূপ অহঙ্কারত্ব দেদীপ্যমান থাকে।

উদার ভাবই জ্ঞানের পরিচায়ক এবং উন্নতির মূল। পূর্ণ জ্ঞানলাভ এবং সর্ব্বতোপ্রকারে উদার ভাবাপন্ন হওয়া মানবের পক্ষে কখনই সহজসাধ্য নহে এবং সেরূপ হইতে পারিলেও তাহার পক্ষে এজগতের কোন কার্য্যই অসিদ্ধ থাকে না; যে হেতু সেরূপ ভাবাপন্নের আত্ম প্রসাদ বা ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভই স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং তাহার উন্নত পথ,আরোহণে ক্লান্তি ও কর্ম্মে শান্তি লাভ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার কবলগত না থাকে, অর্থাৎ কোন কোন সময়ে বা কোন কোন কর্ম্মে তাহাতে আংশিকরূপে জ্ঞানের পরিস্ফুটন হইয়া উদারতা জন্মে, সে সেই পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ বশতঃ উন্নত মার্গে আরোহণক্ষম বা আরোহণ-পরায়ণ হয়। হয়ত কখন কখন সঙ্কীর্ণতার সম্পূর্ণ বিলোপ না হওয়া প্রযুক্ত এবং অবিদ্যার সম্যকরূপে তিরোধান না হওয়ায় অবনত প্রথাভিমুখে আকর্ষিত হইয়া পুনরে বা কথঞ্চিত অবরোহণও করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না হইলেও একান্ত ভাবে তাহার কবলগত না থাকিলে,সঙ্কীর্ণতার পরিমাণও তদনুযায়ী ক্ষুদ্র হইয়া উদারতা বা উন্নত ধারণার সমাবেশ হইয়া থাকে এবং এরূপ অবস্থায় যাহার যে পরিমাণে সঙ্কীর্ণতা ক্ষয় হয়, সে ততদূর উন্নতির পথে অগ্রসরক্ষম হয়। উদারতা সন্ন্যাস কর্ম্মেরই অনুগামী, সন্ন্যাস কর্ম্মই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম, সুতরাং সেই কর্ম্মাচরণ ব্যতীত অন্য ভাবে কর্ম্মাচরণ অর্থাৎ সংসার কর্ম্মাচরণকে অকর্ম্ম বা পাপ কর্ম্মাচরণ কহে, এই কর্ম্মাচরণ অবিদ্যার কবলগত থাকাবস্থায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে ও ইহার আচরণে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইতে হয় এবং তাহা খণ্ডনের শক্তি সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট বা আগ্রহশূন্য হইয়া মোহাভিভূত থাকিলে, সেই ভীষণ অবিদ্যার আকর্ষণে বা প্রলোভনে ক্রমান্বয়ে অবনত পথে অবরোহণ করিতে করিতে অতি শীঘ্রই তাহার নিদানস্বরূপ গভীর নিরয়শায়ী হইতে হয়। রোগ, শোক, আক্ষেপ, অশান্তি, ক্ষুৎপিপাসাদির যাতনা ইত্যাদি যতপ্রকার ক্লেশ ভোগ আছে, তাহার চরম অবস্থাকেই নিরয় কহে, এই অবস্থাগত হইলে তিলার্দ্ধের জন্যও সেই ভীষণ ভোগের ক্ষান্তি থাকে না, অনবরত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভোগই চলিতে থাকে।

জ্ঞান ও অবিদ্যা, এই উভয় প্রতিকূল শক্তির প্রকৃত তত্ত্ব বা উত্তম এবং অধম জ্ঞান উভয়ের কার্য্য বা গুণের বিকাশ দ্বারাই পরিস্ফুট হয়। যখন অবিদ্যাশক্তি বা সঙ্কীর্ণতা হেতু সকাম বা সংসার-কর্ম্মাচারের সত্য তত্ত্ব হৃদয়ে বিশদরূপে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়, তখন জ্ঞানের সন্ন্যাস বা নিষ্কাম কর্ম্মাচারের উদার বা উন্নত ভাব পরিষ্কাররূপে ধারণাগত হইতে থাকে এবং হৃদয়ে যতই তৎবিষয়ের চিন্তা আলোচনার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়, ততই অসার ও অবনতির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ অবিদ্যার কুহক জাল ছিন্ন ও অদৃশ্য হইতে থাকে। সে অবস্থার গভীর কুজ্ঝটিকাযুক্ত

প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণ প্রকাশের ন্যায় বিমল জ্ঞানালোকের যতই বিকাশ আরম্ভ হয়, ততই অবিদ্যার গভীর অন্ধকারময়ী বিকট বা প্রকৃত মূর্ত্তি হৃদয়পটে আবির্ভূত হইতে থাকে, সুতরাং জ্ঞানের অতুল, অনন্ত এবং অপূর্ব্ব পবিত্র মূর্ত্তির সত্তা প্রকাশিত, ধারণামূলে সন্নিবেশিত এবং সংস্থিত হইতে থাকে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে যতই জ্ঞানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, ততই অবিদ্যা দূর হইতে দূরতরে অপসৃত হইতে থাকে এবং অবরোহণের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া, আরোহণ শক্তি সঞ্চারিত এবং ঊর্দ্ধমুখী পথাতিবাহনে অধিকার জন্মে। এইরূপে ঊর্দ্ধপথে যতই অগ্রসর হইতে পারা যায়, ততই উত্থান বেগ প্রবল হইয়া, অতি শীঘ্রই সর্ব্বোচ্চ স্থান বা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ সংঘটিত হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী।

বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি নিবেদন।

বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন দিন সাম্প্রদায়িক বিবাদ ছিল না। চাচা, মামা, ভাই প্রভৃতি সুবাদ ধরিয়া পরস্পর প্রীতি সম্ভাষণে আমরা বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমান চিরদিন সম্প্রীতিতে ও সদ্ভাবে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিলাম। কুক্ষণে ভারতের অদৃষ্টাকাশে কর্জ্জনরূপী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল, কুক্ষণে বঙ্গবিভাগ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে কর্জ্জন-ফুলারের ভেদ-মন্ত্রে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই ফলে কুমিল্লায় দাঙ্গা, জামালপুরে লুট, কলিকাতা সহরে দিনে ডাকাইতি, আরও কত কি হইয়া গেল। কিন্তু ভেদনীতির এখানেই পর্য্যবসান হইল না। হিন্দুমুসলমানে বিচ্ছেদের যেটুকু বাকী ছিল, উদার নীতিপরায়ণ (?) লর্ড মর্লীর তথাকথিত শাসন-সংস্কার (?) তাহার মাত্রা পূর্ণ করিয়া দিল। এখন হিন্দু ভাবিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট মুসলমানের প্রতি অনুচিত পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন; আর মুসলমান ভাবিতেছেন যে, হিন্দু-সম্প্রদায় ঈর্ষাবশে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়া চিরদিনের জন্য নীচে ফেলিয়া রাখিতে ইচ্ছুক। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের মাথা এখন পর্য্যন্ত ঠিক রহিয়াছে, তাঁহারা দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া হায় হায় করিতেছেন, আর যিনি লাটের উপরে লাট, সম্রাটের উপরে সম্রাট, তাঁহার নিকট হিন্দুমুসলমানকে সুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন।

তাঁহাদের প্রার্থনা বিধাতার নিকট বুঝি বা এতদিনে পৌঁছিয়াছে। তাই ভারত-সম্রাটের মুখ দিয়া বঙ্গবিভাগ রদের অপরিবর্ত্তনীয় আদেশবাণী প্রচারিত হইয়াছে। বিধাতার কাজ বিধাতা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কাজ এখনও বাকী।

আমাদের বিহারী ভ্রাতৃগণের ভিতর দিয়া জগদীশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। বিহারের হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ মিলিত হইয়া, যাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান হয়, এবং উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তি বিহারের জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন। যে গোহত্যা হিন্দু মুসলমানের একভাব এক প্রধান অন্তরায়, বিহারের মুসলমান নেতাগণ তাহার নিবারণে সচেষ্ট হইয়াছেন। লর্ড মর্লী মুসলমানদিগকে যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সকল আচরণ মুসলমান সমাজের অসন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে, হিন্দু-নেতাগণ সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইয়াছেন।

আমরা বিহারবাসীদিগের অপেক্ষা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু এবিষয়ে বিহারের নেতৃবর্গ যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী নেতাগণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমানে কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ ছিল না। কর্জ্জন ও মর্লীর ভেদমন্ত্রে আত্মবিস্মৃত হইয়া বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান যে গৃহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ মিলিত হইয়া কি তাহার মীমাংসা করিবেন না ?

অথবা, কেবল নেতাদিগের অপেক্ষায়ই বা কেন থাকি ? হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, আমাদের সকলেরই এবিষয়ে কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে। আমাদের ছোট ছোট কাজে, মুখের কথায় এবং পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে, এই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করার পক্ষে অনেক সহায়তা হইতে পারে। এই কয় বৎসরে হিন্দু মুসলমানের প্রীতির বন্ধন বড় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পরস্পর হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, এখনও সেই পথেই চলিতেছি। এবিষয়ে উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু ত্রুটী আছে। মুসলমান ভ্রাতাগণের ত্রুটীর কথা আর কেন বলি ? পরের কথায় ভুলিয়া এই কয় বৎসর তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন, হিন্দুদের এখন তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু এখন ত্রুটী হিন্দু পক্ষেই বেশী। বঙ্গ-বিভাগ-রদের আদেশ-বাণী প্রচারিত হইবার পর হইতে অনেক হিন্দু, মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত আলাপ ব্যবহারে যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কোন কোন হিন্দু-পরিচালিত সংবাদপত্রও এবিষয়ে সংযমের যথেষ্ট ত্রুটী দেখাইতেছেন। ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিমানের উপর আঘাত লাগিতেছে এবং তাহার ফল এই হইতেছে যে, তাঁহারা হিন্দুদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্র ভাবে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ ক্রমেই বাড়িতে চলিয়াছে। ইহাতে উভয় সম্প্রদায়েরই যে অমঙ্গল হইতেছে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিতেছেন না।

বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের অতি কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত। কলিকাতায় রাজধানী থাকাতে এতদিন সমগ্র ভারতে আমাদের যে প্রাধান্য প্রতিপত্তি ছিল, তাহা গেল। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, আসাম, বাঙ্গালা হইতে সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে চাকরিজীবী বাঙ্গালীর আর অন্ন নাই। বাঙ্গালীজাতির প্রভাব খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে লর্ড কর্জ্জন যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমেই অঙ্কুরিত হইতেছে। এই জাতীয় সমস্যার দিনে, আমরা হিন্দু মুসলমান আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিলে, তাহাতে

উভয় পক্ষেরই অকল্যাণ হইবে। উপস্থিত জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইবার জন্য আমাদের চাই একপ্রাণতা, চাই দৃঢ়তা, চাই হিন্দু মুসলমান পাঁচকোটী বাঙ্গালীর সমবেত শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা।। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী নামের গৌরব রক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে শিক্ষায় আরও উন্নত হইতে হইবে, চরিত্র-বলে আরও বলীয়ান হইতে হইবে, এবং হিন্দু মুসলমানের সমবেত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পথে জাতীয় দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। এখন হিন্দুর স্বার্থ, মুসলমানের স্বার্থ ভুলিয়া আমাদিগকে হিন্দু মুসলমান পাঁচকোটী বাঙ্গালীর স্বার্থ অন্বেষণ করিতে হইবে। অতএব এস ভাই, বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান, আমরা পরস্পরের রক্তে বলীয়ান হইয়া, একপ্রাণে, একধ্যানে, সেই জাতীয় কল্যাণের পথে অগ্রসর হই। তাহাতে সকলেরই কল্যাণ লাভ হইবে।

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আবরণ।

খুলে ফেল আবরণ, মুক্ত কর পট,
দেখাও সে নগ্ন দৃশ্য, সৌন্দর্য্য মহান;
ছায়ুক নিখিল বিশ্ব, হে অক্ষয় বট!
তোমার শীতল ছায়ে লভুক পরাণ।

অনন্ত সৌন্দর্য্যময় এত আবরণে
ঢাকিও না আর, প্রভো! বদন তোমার,
তৃপ্ত যদি হবে ধরা বারেক দর্শনে
আজন্ম-বাঞ্ছিত সেই রূপের ভাণ্ডার।

শক্তির কণিকাদৃষ্ট এ বিশ্ব হেরিয়া
বুঝিতে তোমার শৌর্য্য, হে শক্তি-আধার!
বৃথা যত্ন করে নর, করুণা করিয়া
কামনা সফল যদি নাহি কর তার।

লভি জ্ঞান, বহু শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
কে কবে তোমার দেব পেয়েছে সন্ধান।
যতনে দর্শন তব পাবে কোন জন,
আপনি না কবে দাও যার চক্ষুর্দান?

ডাকি তাই, খুলে দেও চখের বাঁধা
মানবের, নগ্নবেশে দাঁড়াও হাসিয়া
জগতের মাঝে, হেরি এ দৃশ্য নূতন
আনন্দে নিখিল বিশ্ব যাউক ভাসিয়া।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

উদাসীর গান।

(১)

জীবন যাবে কি বিফলে?
কহনা জননী দিবস-রজনী
ভুলাইয়া রাখ কি ছলে?
আমি চাই ওই পাখীটীর মত
উদার আকাশ-বুকে,
আপনার মনে গাই মা, সতত
অসীম অপার সুখে।
কোন বাধা নাহি রবে কোন খানে
ফিরে নাহি চাব কারো মুখ পানে,
আকুল পুলকে সকল পরাণে
বিকাব ও পদ-কমলে।
কেন তুমি মাগো, কামনা আমার
বিফল করিয়া দাও বারবার,
সোণার স্বপন দেখায়ে মায়ার
বেঁধে রাখ মোরে শিকলে।
জীবন যাবে কি বিফলে?

(২)

আমি কি ফিরিব কাঁদিয়া?
আজনম ধরি', দিবা-বিভাবরী
আঁখি-জল শুধু গাঁথিয়া?
আমি চাই ওই কুসুমের সম
ফুটি মা, তোমার বনে,
তৃষিত মধুপে তুষি নিরুপম
সুনীরবে নিরজনে!
কোথাও না রবে বেদনার লেশ,
হাসি-সুষমার অমিয়-আবেশ
ছোট বুকে কভু নাহি হবে শেষ
একটী নিমেষ লাগিয়া!
কেন তুমি মাগো, মোর সাধখানি
মিটাতে না দাও কি ছলে কি জানি,

আলেয়ার পিছে আপনারে দানি'
তৃণ হেন যাই ভাসিয়া।
আমি কি ফিরিব কাঁদিয়া?

(৩)

আমি কি ডুবিব আঁধারে?
চির-অসহায় অভাগার প্রিয়
তোমার ভুবন মাঝারে।
আমি চাই ওই নদীটীর হেন
তুলিয়া মধুর তান,
খুঁজিয়া বেড়াই ডাকে মোরে কেন
পারাবার সুমহান্।
অতুল তারকা-তপন-শশীতে
মোর সাথে সদা আসিবে খেলিতে,
আলোকের ঢেউ চকিতে চকিতে
জাগাইয়া যাবে আমারে!
কত দিবসের অভিলাষ মম
সকল মনের কত প্রিয়তম
পূরাতে মা, কেন হও নিরমম
ঘুম-ঘোরে ঢাকি দুয়ারে।
আমি কি ডুবিব আঁধারে?

(৪)

আমি কি মরিব হতাশে?
"মা" বলে তোমায় ডেকেছি যে হায়,
লুটায়ে চরণ সকাশে!
আমি চাই ওই নীরদের মত
সুনীল গগন-পথে,
উধাও হইয়া যাই মা, নিয়ত-
মৃদুল সমীর-রথে।
প্রাণের প্রবাহ বিলায়ে আমার
নিবারি পিপাসা তাপিত জনার,
নব বেশে ধরা সাজাই অপার
অরুণ শ্যামল-বিলাসে!
এ আশাটী মোর করিতে সফল
কেন মা, বিরূপ তুমি গো কেবল,
দোলায়ে নিরত মোহের আঁচল
রোধিলে ধূলির আবাসে।
আমি কি মরিব হতাশে?

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্মৃতি।

সমাপিয়া সর্ব্বকাজ দীর্ঘ দিবা অবসানে,
ক্লান্ত দেহে, ততোধিক অবসন্ন শ্রান্ত প্রাণে,
একান্ত একেলা যবে নিরজনে বসি আসি,
ধীরে প্রাণে ওঠে জাগি স্মৃতির লহরী রাশি।
বয়ে যায় সুশীতল মৃদু সান্ধ্য সমীরণ!
শীতল করিতে যেন চাহে দগ্ধ এ জীবন।
ধূসরা সন্ধ্যার ওই আকুল আঁচল তলে,
একটী দুইটী তারা ধীরে ধীরে ওঠে জ্বলে।
নীরব মলিন সাঁঝে একেলা এ নিরজনে,
কবেকার কত স্মৃতি উথলিয়া উঠে প্রাণে।
নবীন জীবনে সেই কি উদ্যম, কত আশা।
কার সে অমৃত ভরা স্নেহ দয়া ভালবাসা,
দুদিনের সে অতুল স্বর্গছবি স্বপ্ন সম,
চির মরীচিকা ঘেরা আজিকার এ জীবন!
সেদিনও আমিই ছিনু আজিও রয়েছি আমি,
সে স্বপ্ন কি এ স্বপন, কি কহিব নাহি জানি।

শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী।

বসন্তে।

কি আনন্দ। কি উল্লাস!
কর্চ্ছে প্রাণে আসা যাওয়া,
ফুর ফুরিয়ে বইছে ধীরে
বসন্তে আজ দক্ষিণ হাওয়া!
ফুলগুলি ওই বদন তুলি
হাস্‌ছে বনে মধুর হাসি!
ছড়িয়ে দিচ্ছে সৌরভ-সুধা
হয়েছে তাই প্রাণ উদাসী!
আকুল হয়ে কোকিল গুলি
আপন ভুলি গাইছে গান!
উঠ্‌ছে বেজে এ বসন্তে
দিগদিগন্তে বেণুর তান!
যুগান্ত সে লুকিয়েছিল
হৃদয় হতে কত দূরে,
আজ, ভালবেসে, মধুর হেসে
পড়্‌ছে এসে মরম-পুরে!
(তার) সে আঁখি দুয়না ফাঁকি
নিচ্ছে ঢেলে পীযূষ রাশি!
রাঙা ঠোঁটে উঠ্‌ছে ফুটে
পারিজাতের মধুর হাসি!
ধরার বুকে হাস্‌ছে সুখে
কুঞ্জ কানন, বন উপবন!
জেনো সবে আজকে হবে
বধুর সনে মধুর মিলন!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

স্বাদেশিকতা।

বহু দিবসের ঘন-তমসা বিদলিত করিয়া, বঙ্গ ভঙ্গকে নিমিত্ত মাত্র করতঃ অকস্মাৎ ভারতবাসীর হৃদয়ে যে ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যে ভাব উচ্ছ্বাসের ন্যায় অকস্মাৎ সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিয়া দেশে একটা নবযুগের অবতারণা করিয়াছে, যে ভাব দেশবাসীর হৃদয়ে এমন ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহার মূলোৎপাটিত করা দুঃসাধ্য, যাহা আর কোন প্রকারে মুছিয়া দিবার উপায় নাই, সেই স্বাদেশিকতার ভাব কি এই নবযুগের পূর্ব্ব হইতেই এ দেশবাসীর হৃদয়-পদ্মে ধীরে ধীরে আসন বিস্তার করিতেছিল, অথবা প্রস্তর ঘর্ষণ-জনিত অগ্নির ন্যায় অকস্মাৎ সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিল? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, এই স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা দৈববাণীর মত আত্ম প্রকাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপকরণ বহু দিবস হইতে সংগৃহীত ছিল, বঙ্গ ভঙ্গ তাহাতে অগ্নি সংযোগের কারণ মাত্র। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে এই নবযুগের পূর্ব্বযুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, সমস্ত দেশটা যেন একটা নীরবতার আবরণে আবৃত, স্থির, স্পন্দন-শূন্য, নির্জ্জীব। যেন তাহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, অপরের স্বার্থের সহিত তাহার স্বার্থ মিশিয়া গিয়াছে। আবার একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঐ কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, সেই নির্জ্জীবতার মধ্যে একটা সজীবতা অঙ্গার প্রদীপ্ত মস্তকোত্তলন করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; যেন রাসায়নিক সংযোগের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত, তবে তাহা বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, যেন জীবশরীর গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রাণে কেবল স্পন্দন আসে নাই। কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে এবং সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে ইহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে হইলে তাঁহাদের কাব্য ও উপন্যাস ধরিয়া চিনিতে হইবে, তাঁহাদিগকে জানিতে হইলে, তাঁহাদের স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সময়ের মধ্যে দিয়া তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে। এই নবযুগের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে ক্ষুদ্র দেখা যাইবে, কারণ দেশ এখন আর সে স্তরে নাই, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক উচ্চে। তাঁহাদিগের মধ্যে যে এই স্বাদেশিকতার ভাব, এই হৃদয়ের ভক্তি উচ্ছ্বাস-মাখা শৃঙ্গধ্বনি "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" এবং পবিত্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, আদিকবি বাল্মীকির কণ্ঠনিঃসৃত 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ' বলিয়া ভারতীর প্রথম আগমনের ন্যায় প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে পরিমাণ আসিয়াছিল—হউক ক্ষুদ্র, হউক তাহা মৌখিক,—কিরূপে, কোথা হইতে তাঁহাদের মধ্যে এ স্বর্গীয় ধ্বনি উত্থিত হইল, তাঁহাদের নিকট উহা অবিদিত থাকিতে পারে—কিন্তু বাল্মীকির সেই আদি সঙ্গীতের পর কত কত সালঙ্কৃতা মাধুর্য্যগর্ভা কত কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীনটা যেমন আকাশবাণীর ন্যায় কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, তেমনটী আর হইল কৈ? সেইরূপ তাঁহাদের সেই স্বাদেশিকতা ও চিন্তার ফলেই যে এই বিরাট জাগরণ, এই তুমুল আলোড়ন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে যাঁহারা দুনিয়াটা শুকদেবের ছাঁচে গড়িতে চান, অথবা সৃষ্টির অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া,

> "স্বর্গে ন গন্ধঃ ফলমিক্ষুদণ্ডে,
> নাকারি পুষ্পং খলু চন্দনস্য
> বিদ্বা বিনোদী নহি দীর্ঘজীবী
> ধাতুঃ পুরে কোঽপি ন বুদ্ধিদাতা।"

বলিয়া আপনাকে অধিক জ্ঞানী মনে করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা।

তারপর সেই মহামন্ত্রের ক্রমবিকাশ হইয়া কিরূপে তাহার অভিব্যক্তি হইল এবং কি জন্য সেই ভাবকে ভারতবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভালবাসিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহাই দ্রষ্টব্য। বহু দিবসের পদাঘাত-জর্জ্জরিত ভারতবাসী যখন বিধাতার নিকটে

তাহাদের সকরুণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে-ছিলেন, যখন প্রাণভরা হাহাকার লইয়া ঊর্দ্ধপানে সজল নেত্রে চাহিতেছিলেন, বিধাতা তাহাদের তপ্ত আঁখি-ধারায়, তাহাদের বেদনাভরা মর্ম্মোচ্ছ্বাসে ব্যথিত হইয়া সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে এই স্বাদেশিকতার ভাব তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু তখন তাহা নিস্পন্দ, জড়, অচেতন। তারপর যখন তাহা একটা বস্তুরূপে পরিণত হইল, যখন তাহার মন্ত্র তন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, কেবল চালনা মাত্র অবশিষ্ট, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানি শুভ হস্ত শত্রুভাবে আসিয়া মানচিত্রে একটা ব্যাস-রেখা টানিয়া বঙ্গকে বিকলাঙ্গ করিবা দেশময় বিপুল স্পন্দন আনিয়া দিল। যেন সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিল যে, অন্য জাতির প্রবল সংঘর্ষে তাহারা বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কোথা হইতে যেন প্রাণে একটা উন্মাদনা আসিল, তাহাতে সকলেই মাতিয়া উঠিল। ভগবান "জ্ঞানাঞ্জন শলাকা" দ্বারা চক্ষু রুন্মিলিত করিয়া দেশবাসীকে আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের ভিন্ন সত্তা লোপ পাইতে বসিয়াছে। তখন সকলে মিলিয়া গর্জ্জনে মেদিনী কম্পিত করিয়া মায়ের নাম উচ্চারণ করিলেন। তখন ভারতবাসী দেশকে মা বলিতে শিখিলেন, তখনই এই মহা ভাবের অভিব্যক্তি, তখনই একটা মহা জাতি গঠনের সূচনা—রঙ্গ মঞ্চে দৃশ্যপট-পরিবর্ত্তন।

এমনভাবে যুগ পরিবর্ত্তিত হইল যে, কেহ চিন্তা করুক বা না করুক, ইহার বিষয় উপলব্ধি, ইহার জন্য কি প্রয়ো-জন, ইহার কত গুরুত্ব, ইহা সৎ, কি অসৎ, সত্য, কি অলীক, সমস্ত বিবেচনা করিবার অবসর না দিয়াই অযাচিত ভাবে, দেশবাসীর হৃদয়ে তাহার অজিন আসন বিস্তৃত করিল। বহু দিবসের দাব-দগ্ধ হৃদয় স্নিগ্ধ স্পর্শে শীতল হইল। সকলেই তাহাকে ভগবৎ-প্রেরিত মনে করিয়া আকড়াইয়া ধরিল। তখন স্বাদেশিকতা জাতির হৃদয়ে আশ্রয় পাইয়া ধীরে ধীরে তাহার অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু এত বড় বিরাট দেশের সকলে তাহাকে চিনিল না, তাহাকে প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। চিনিতে পারিল যাহারা, তাহারা এই বিরাট জনমণ্ডলীর তুলনায় অতি মুষ্টিমেয়। যাহাদের হৃদয়ে আবিলতা নাই, যাহারা স্বার্থের পূতিগন্ধ-দুষ্ট নহে, যে প্রাণে একটা কর্ম্মপ্রবণতার ভাব বিদ্যমান, যাঁহারা সমস্ত বন্ধন-মুক্ত, তাঁহারাই ইহাকে প্রাণের বস্তু বলিয়া চিনিয়া আপন বুকের মধ্যে অতি যত্নে, অতি সংগোপনে তাহাকে স্থান দিলেন, তাঁহারা ইহাকে অস্থি মজ্জার সহিত জড়িত করিয়া তাহার সাধনকে জীবনের মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং পরীক্ষার সময় হইলে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া মুক্তি-মন্ত্র প্রচার করিতে হইলে কি সাধনা, কি ত্যাগ, কি কঠোর সংযম আবশ্যক, তাহার একখানি অতি উজ্জ্বল চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলেন। আর যাঁহারা "শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন" ভাবিয়াই অস্থির, দুই কুলই বজায় রাখিয়া ষোল আনা স্বার্থের মালিক হইয়া দেশের কাজ করিবেন বলিয়া আসরে নামিলেন, তাঁহারা এ পবিত্র ব্রত অবগত হইতে পারিলেন না, অথচ বৃথা যশোলাভ অথবা নীচ স্বার্থসাধনের আশায় দেশের সম্মুখে ক্ষুদ্র আদর্শ ধরিয়া, ক্ষুদ্র আশা লইয়া, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা অবলম্বন করিয়া নেতা সাজিয়া এত দিন দেশের উন্নতির গতি রোধ করিলেন এবং আজও করিতেছেন। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে এ উন্নতির বাধা দিয়া দেশের প্রতি শত্রুতা-চারণ করিতেছেন। তাঁহারাই প্রকৃত শত্রু, তাঁহারা পবিত্র, হোমানলে অপবিত্র পাপরাশি নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে বসিয়াছেন। তাঁহারাই দীনদরিদ্র অনাথ ভারতবাসীর মুখের গ্রাস, দেশের নামে সংগ্রহ করিয়া মটর, ব্রুহাম হাঁকাইতেছেন, আর অসার আন্দোলন ও ভিক্ষা বৃত্তির দোহাই দিয়া বাঁচিয়া যাইতেছেন।

এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিবার কারণ কি? যাহারা পবিত্র মাতৃমন্দিরে স্পর্শ করিয়া ব্রত গ্রহণ করিল, যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে খ্যাত, তাঁহা-দের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা, এ ধর্ম্মের নামে প্রবঞ্চনা কেন? এ দূষিত পদার্থ কিরূপে তাহাদের

মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল, কিরূপে এই ক্ষুদ্রতা নীচতা স্থান পাইল? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আছে, এত দীর্ঘ কালের ব্যাধি কি সহজে আরোগ্য হইবে? যখন সেই উত্তেজক ঔষধ পড়িল, অমনি একটা মাদকতা, একটা উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই উত্তেজনার বলে সকলেই উঠিয়া বসিল, কিন্তু হঠাৎ উত্তেজনা হইলেই অবসাদ (Reaction) অবশ্যম্ভাবী। দুর্ব্বল নাড়িতে উত্তেজক ঔষধ পড়িয়াছিল, তাহার ফলে ঘোর অবসাদের ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। যখন এ ভাব প্রথমে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তখন কয়েকজন মহাপুরুষ ভিন্ন আর কেহ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। হঠাৎ বন্যা আসিল, তাঁহারা তাহাতে গা ভাসাইয়া লক্ষ্যহীন ভাবে চলিলেন, তাহার মধ্যে কতকটা ত্যাগ আছে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই,—বুঝিতে পারেন নাই, এ একটা ছেলেখেলা নয়—একটা মুক্তি-মন্ত্র। তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই যে, এ পবিত্র প্রেমের নামে ভেল্কিবাজী চলে না। এ মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইলে নিষ্কাম সন্ন্যাসী সাজিতে হয়। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, জগতের মুক্তির মন্ত্র তাঁহাদের নিকট আসিয়াছে, তাই তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—তাই বর্ত্তমান অবস্থা তমসাচ্ছন্ন।

কিন্তু যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উদ্‌যাপন আমাদিগকে করিতেই হইবে। এ অবস্থায় নিরাশ হইলে চলিবে না। "একুশ আছাড়" খাইয়া নিশ্চয় উঠিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিতে হইবে। দেশের দুর্দ্দশার কথা তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই বলিয়াই চিন্তা ও সাধনার মধ্যে অনিবার্য্য বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িতেছে। যত দিন এ অবস্থা থাকিবে, ততদিন কোন প্রকারে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ততদিন পৃষ্ঠে সজোরে কশাঘাত করিলেও উঠিবার শক্তি হইবে না, ততদিন সাহিত্যিকের সজোর লেখনীর আঘাতে, রাজনীতিজ্ঞের বাকপটুতায়, সমাজসংস্কারকের ভ্রুকুটীতে, ধর্ম্মসংস্কারকের ধর্ম্মব্যাখ্যায় কিছুতেই সুফল ফলিবে না। ততদিন ভারতবাসী দশে মিলিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কিন্তু আত্মগ্লানির দ্বারাই কি অবস্থার অপনোদন সম্ভব হইবে? এই বহু শতাব্দী হইতে 'আমরা কিছু না, আমরা কিছু না' বলিয়া চীৎকার করিতেছি, তাহাতে কি শুভফল হইল, বরং আমরা আরও রসাতলে যাইতে বসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে সেই ভগবান-প্রদত্ত "স্বাদেশিকতা" প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় হেলায় যাহাতে না হারাই, তাহার উপায় কি? এখন সেই উপায় নির্দ্ধারণের সময় উপস্থিত। কোন্ গুণে অন্যান্য সমস্ত জাতি ভূষিত, যাহাতে তাহারা ক্রমেই জাতীয় উন্নতির উন্নত সোপানে আরোহণ করিতেছে? সেই সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদিগকে চরিত্রগত করিতে হইবে, তাহা চরিত্রগত করিবার উপায় সেই সদ্‌গুণ-বিকাশক কর্ম্মক্ষেত্র।

উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। এখন যেরূপ আদর্শ ধরিয়া দেশের সাধারণ চলিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি কল্পনা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অধিক উন্নতির চেষ্টা করিলে বকাণ্ড প্রসব করিবে। যদি দেশে মহত্তর মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, তাহার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কর্ম্মবীজ বপন করিলে, উপযুক্ত কর্ম্মের তাড়নায় মনুষ্যত্ব অঙ্কুরিত হইবে, নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় আত্মচিন্তা হারাইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ শিক্ষা করিয়া একজন সিবিলিয়ান, একজন ডেপুটী, একজন উকীল, একজন কেরাণী প্রস্তুত হইবে, তাহাতে মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন ধার্ম্মিক বীর জন্মগ্রহণ করিবে না। যাঁহারা সেই ধূয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগের আশা ব্যর্থ হইবে। জগতের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই, কোন দিন কোন মহাপুরুষ আপনি আসিয়া কর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। দেশের সাধারণ যখন ব্যাকুল ভাবে উদ্ধারের নিমিত্ত কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং ভগবানের নিকট তাহাদের অভাব জানায়, তখনই অবতাররূপে মহাপুরুষের জন্ম হয়। কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে মহাপুরুষের আগমন অসম্ভব।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

৯৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পুরোহিত।—শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য।০। বঙ্গদেশে সাহিত্য ব্রাহ্মণগণ কল্পিত ব্রাহ্মণ বলিয়া পতিত ও অনাদৃত।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"সাহিত্য জাতির প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করায় বাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিও সাহিত্যের ভক্তির লাঘব করা হইতেছে। সমাজের পক্ষে এইরূপ দ্বেষাদ্বেষি ভাব সমাজের অধঃপতনের হেতু।"

৯৬। কারবালা।—শ্রীআবদুল বারি প্রণীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১।০। মনুষ্যের নির্ম্মম অত্যাচার-মূলক ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তক কবিতাছন্দে রচিত। দীনা বঙ্গভাষায় মুসলমান-সন্তানগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম, পুরাণ, কাব্য, ইতিহাস ও সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বিবিধ মণিমাণিক্য রত্নসম্ভার আহরণ করিয়া মাতৃভাষাকে উপহার দিলে তাঁহাদের এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। এই নূতন কবির উদ্যম প্রশংসনীয়।

৯৭। কবিতানুবাদ কঠোপনিষৎ।—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ, বিরচিত। মূল্য ৷৷৴০। রচনা, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সবই সুন্দর ও অতি মনোরম। কঠিন ও দুরূহ উপনিষদের কথা এমন সরল, প্রাঞ্জল, স্নিগ্ধ, সুললিত বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারা যায় না। যোগীন্দ্রবাবুর লেখনী ধারণ ধন্য। এই কবিতাছন্দে বর্ণিত নচিকেতার উপাখ্যানটী প্রত্যেক বালক বালিকার হাতে দেওয়া উচিত। মূল শ্লোকগুলি প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা জনক জননীদিগেরও অতি আদরের সামগ্রী হইবে।

৯৮। রাণী দময়ন্তী।—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধা ৷৵০। ভাষা অতি সুন্দর। ছবিগুলি মৃত-পত্রিকার ছবির ন্যায়। পুস্তকখানি শিশুদিগের জন্য লিখিত, কিন্তু তার প্রথমেই "বসন্ত এল ** নলের মনে কিসের ভাবনা? * * কাকে যেন তার মন চায়,—কাকে যেন তিনি খোজেন,—কই দেখাত তার মিলল না।" ইত্যাদি। এই প্রেমকাহিনী বালক বালিকাদিগের হাতে দিবার উপযুক্ত নহে।'

৯৯। ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ, তৎ সহ জীব ও জগতের সম্বন্ধে বিচার নামক জ্ঞান-কথা। শ্রীবলাইচাঁদ নন্দীমল্লিক প্রণীত। মূল্য ৴০। বারপেজী ফর্ম্মার আড়াই ফর্ম্মার পুস্তিকায় বড় বড় সুদীর্ঘ বিষয় শিক্ষক ও বালকের কথোপকথনে শেষ হইয়াছে।

১০০। Theism The Nation's need ১৬০৬ সালে ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন-সভায় পঠিত ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর [illegible]। মহারাজ বাহাদুর অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যকে উৎকলের করদ রাজ্য সকলের আদর্শ স্থানীয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রতি পংক্তিতে তাঁহার যোগ্যতা ও সুশিক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন, "Your Theism, call it by what name you will, will be your salvation."

১০১। সোণায় সোহাগা। (উপন্যাস) শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত, মূল্য ৷৷০। ইহা "পুণ্য" নামক একখানি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের গল্পরচনার শক্তি আছে, কালে তিনি একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হইতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

১০২। ধর্ম্ম সমন্বয় বা পন্থা।—শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুবাদিত। মূল্য ।০। শ্রীমৎপরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সৌর মন্ত্রের সাধক। গ্রন্থকার বেদ, গীতা ও দর্শনের সমন্বয় করিয়া দেখাইতে

চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক মাত্র 'সূর্য্য নারায়ণই' সকল শাস্ত্রের পূজনীয় ও বরেণ্য দেবতা।

১০৩। গো,গঙ্গা ও গায়ত্রী।—শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১্। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করিয়া গো, গঙ্গা, গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা পুস্তকের শেষাংশের 'ব্রহ্মচর্য্য' প্রত্যেক বঙ্গবাসীকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শাস্ত্র বলেন—

আজন্ম মরণাদ্ যস্ত ব্রহ্মচারী ভবেদিহ।
নতস্য কিঞ্চিদ্প্রাপ্যমিতিবিদ্ধি নরাধিপ।

১০৪। *প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি, তৃতীয়ভাগ* (মানবের আদি জন্মভূমি)। শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। গ্রন্থকার পরিশ্রম যথেষ্ট করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ আজ পর্য্যন্ত আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান সম্বন্ধেই কোন স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে পারেন নাই। সুমের নাম সাইবেরিয়া, মধ্যএশিয়া, বক্ষা নদীর তীর, বল্টিক সাগরের তীর প্রভৃতি নানাস্থান নানা জনে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সহজেই অসাধারণ প্রতিভাবলে মানব জাতির আদি জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। বিংশ শতাব্দীতে গবেষণা করিতে হইলে এতকাল জীবনব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ যে সকল তথ্য স্থির করিয়াছেন, তাহা আয়ত্ত করিয়া মৌলিক গ্রন্থসকল অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া স্থিরতা ও ধীরতার সহিত বিচারে বুদ্ধি সহকারে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। একদেশদর্শিতা, অহমিকা, এবং বৈজ্ঞানিক বিচার প্রণালী ও সংযমের অভাব এই পুস্তকের প্রধান দোষ। অবতরণিকা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে, হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহে এমন একটী কথাও নাই যে, তাঁহারা ভারতের বাহিরে কোন জনপদ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন যে,আর্য্যগণ বাক্ট্রিয়া বা ঐরূপ কোনও তথাকথিত মধ্য এশিয়া হইতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া একদল ককেশশের পার্শ্ব দিয়া ইউরোপে ও অন্য দল পারস্যের ইরাণে আসিয়া উপনীত হয়েন। পরে গৃহবিবাদ নিবন্ধন একদল ইরাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতে যাইয়া হিন্দু জাতির ভিত্তি পত্তন করেন।"

অন্যত্র—"পাশ্চাত্য মনীষিগণের কোনও একটী কথার মূলেই কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই।" ইত্যাদি।

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। ঐতিহাসিকগণ বুঝিতে পারিবেন।

১০৫। ছড়া ও গল্প।—(সচিত্র) অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, মূল্য ।০। ছাপা, চিত্র, রচনা সবই মনোরম। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটী গল্প অতি মধুর, সরল, প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভাষায় বালক বালিকাদের জন্য লিখিত হইয়াছে। ললিতবাবুকে আমরা চিরদিনই সুরসিক অধ্যাপক বলিয়া জানি, তাঁহাকে কখনও "অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্যের অবতার" বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পাকা হাতের লেখা যে শিশুদিগের মন ভুলাইতে পারিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

এই বৎসরের শেষাংশে আর যে সকল পুস্তক পাইয়াছি, তাহার সমালোচনা অবশিষ্ট রহিল।